কবিতা

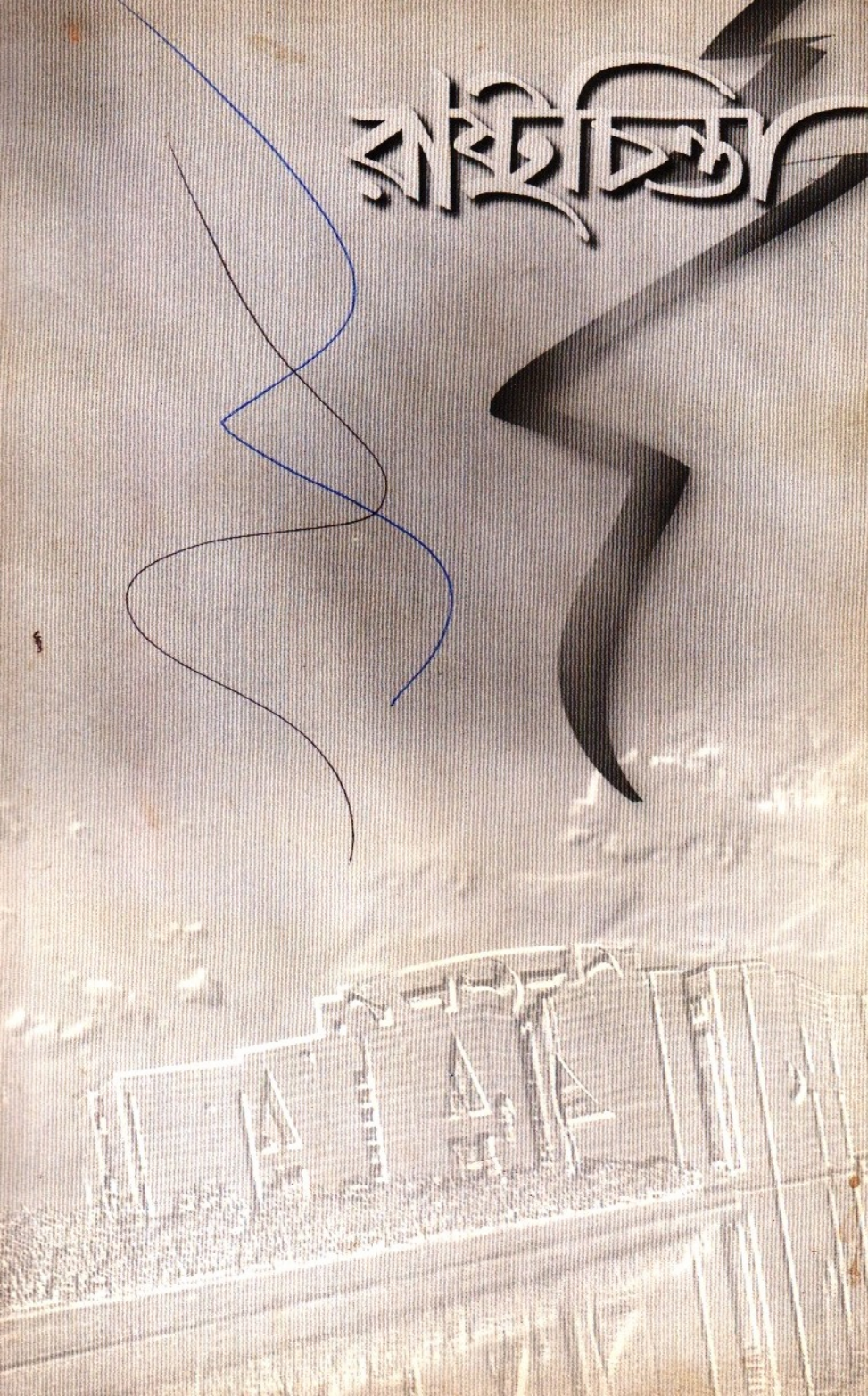

রাষ্ট্রচিন্তা

প্রথম সংকলন ডিসেম্বর ১৯৯৮

সম্পাদনা পরিষদ

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী

ড. তারেক শামসুর রেহমান

এম. মুজাহিদুল ইসলাম

ড. মোহাম্মদ আবদুর রব

ফেরদৌস হোসেন

মাসুদ মজুমদার

আতা সরকার

মিজানুর রহমান খান

মাসুমুর রহমান খলিলী

সম্পাদক

আহমদ হোসেন মানিক

www.pathagar.com

রাষ্ট্রচিন্তা

প্রথম সংকলন ডিসেম্বর ১৯৯৮

প্রকাশক
জ্ঞানযোগ
৩২, পুরানা পল্টন, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৯৫৫৭৪০১

ব্যবস্থাপক
মোসতাক আহমদ

প্রচ্ছদ
রিয়াজ হায়দার

কম্পিউটারাইজেশন
ডটপ্লাস লিমিটেড

মুদ্রণ
চৌকস প্রিন্টার্স লিঃ
১৩১, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা

মূল্য
ত্রিশ টাকা

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান
বাংলাদেশের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি ঃ একটি বিশ্লেষণ ৭
ড. নাজমা চৌধুরী
নারী ও রাজনীতি ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ১৩
ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী
বর্তমান বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় প্রতিরোধে ইসলামী বিকল্প ঃ একটি প্রাথমিক টীকা ২১
ড. তারেক শামসুর রেহমান
বাংলাদেশ ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন ৩৫
তারেক ফজল
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ঃ ভিন্নতার স্বরূপ ৫০
মিজানুর রহমান খান
বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা ৬৩
মাসুমুর রহমান খলিলী
অর্থনীতির কয়েকটি ইস্যু ও সাহায্যদাতাদের পরামর্শ ৭৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রসঙ্গতঃ

'রাষ্ট্রচিন্তা' রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে দেশের চিন্তাশীল শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী-লেখকের লেখা নিয়ে বের হচ্ছে। যাত্রার শুরুতে আমাদের অঙ্গীকার এদেশের মাটি ও মানুষের প্রতি, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি।

রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান হলো মাটি, মানুষ ও সার্বভৌমত্ব। এ তিনটি নিয়ে রাষ্ট্রচিন্তা তার জগৎ নির্মাণ করবে। এ ভূখণ্ডের ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো। ইতিহাসের অনেকগুলো পর্ব পার হয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ তার যাত্রা শুরু করেছে। অতীতের গ্রন্থিমূল উপড়ে ফেলতে চাইলে এ যাত্রায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। তাই অতীতের গৌরব যেমন হবে আমাদের অবলম্বন তেমনিভাবে ভুল থেকেও আমরা শিক্ষা নিতে চাই।

বাংলাদেশের ইতিহাসে উল্লেখ করার মত যেমন স্বাতন্ত্র্য আছে তেমনি এ ভূখণ্ডের মানুষের ভাবনা-চিন্তা-কৃষ্টি- চলনেরও নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এসব বৈশিষ্ট্য দেশের এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে সাহায্য করে এবং শক্তি যোগায়। আবার অনেক দুর্বলতা এগিয়ে যাবার পথে বাধারও সৃষ্টি করে। এসব বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা জাতি হিসেবে আমাদের টিকে থাকতে সহায়তা করবে।

স্বাধীনতার পর থেকে এদেশের সরকার ও রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি নিয়ে বেশ বির্তক চলে আসছে । পৌনে তিন দশকের রাষ্ট্র পরিচালনার ইতিহাসে অনেক উত্থান-পতনও হয়েছে । এ উত্থান-পতনের সাথে রাজনীতির সংশ্লিষ্টতা ছিল অবিচ্ছেদ্য। রাজনীতির গতি প্রকৃতি, সরকারের উত্থান-পতনের এই গতি ধারার বিশ্লেষণ আমাদের পর্যালোচনার বিষয় হবে। তবে রাজনৈতিক পক্ষপাত এ বিশ্লেষণের বস্তুনিষ্ঠতাকে আক্রান্ত করবেনা।

দেশের সার্বভৌত্ব ও অখণ্ডতা থাকলে এ ভূখণ্ডের মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন অস্তিত্ব থাকবে। সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার দায়িত্ব এ দেশের জনগণের । এ দায়িত্ব পালনে যে কোন ভুল ষড়যন্ত্রকারীদের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার অপচেষ্টাকে সফল করবে। এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির দায়িত্ব দেশের চিন্তাশীল মহলের। 'রাষ্ট্রচিন্তা' এই ইতিবাচক চিন্তাকে এগিয়ে নিতে চায়।

সংকলন হিসেবে 'রাষ্ট্রচিন্তা'র প্রথম সংখ্যাটি বের হচ্ছে। তবে পর্যায়ক্রমে এটাকে চিন্তাশীল পাঠকদের সামনে নিয়মিত 'মাসিক' হিসেবে তুলে দেয়ার ইচ্ছা রয়েছে আমাদের। এ বিষয়ে দেশের চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী এবং সচেতন মহলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশের রাজনীতির গতিপ্রকৃতিঃ একটি বিশ্লেষণ

ডঃ তালুকদার মনিরুজ্জামান*

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে বাংলাদেশের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি আলোচনা করতে গেলে আমি অনেক সময় খুবই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুধু একটি বড় ধরনের ঘটনাই ছিল না, বাংলাদেশীদের জন্য ছিল শ্রেষ্ঠতম ঘটনা। কিন্তু যে-প্রত্যাশা নিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল, তা নষ্ট হয়ে যায় যখন এদেশে একদলীয় শাসন চালু করা হয়, যা আমাকে যথেষ্ট দুঃখ ও কষ্ট দেয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনার সঙ্গে এই ঘটনাকে কোনোভাবেই মেলানো যাবে না। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তিনি মুক্তিযুদ্ধকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন–এ কথাটা যেমন সত্য, তেমনি এটাও সত্য শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বুর্জোয়া মানসিকতা, স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগের সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার অপরিণামদর্শী চিন্তাধারা, আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনের একটা অংশের বিদ্রোহ (যারা জাসদ নামে পরে আত্মপ্রকাশ করেছিল) দেশে ১৯৭৫ সালের আগস্টের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পটভূমি সৃষ্টি করে। শেখ মুজিব, যিনি ছিলেন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম স্থপতি, তিনি সপরিবারে নিহত হন আগস্টের রক্তক্ষয়ী ঘটনায়। ১৯৭৫ সালের আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের রেশ ধরে এ দেশে পর্যায়ক্রমে আরও কয়েকটি সামরিক অভ্যুত্থান হয়। তবে ১৯৭৫ সালের আগস্টে যে সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছিল, তা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ব্যতিক্রম নয়। উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের স্বাধীনতা লাভের পর এ-ধরনের ঘটনা অনেক প্রত্যক্ষ করেছে। তবে শেখ মুজিবের নিহতের আরেকটি অন্যতম কারণ হচ্ছে পাকিস্তান আমলে সৃষ্ট 'অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট' ধারার নেতিবাচক রাজনীতি। রাষ্ট্র-গঠনের পরপরই তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধিতা শুরু হয়েছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশগঠনে শেখ মুজিব প্রচুর সময় পাননি। বিরোধিতাসর্বস্ব যে রাজনীতি আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, স্বাধীনতার পরও তা অব্যাহত থাকে।

---

* প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

তবে ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী সংবাদপত্র ও বিচারবিভাগের স্বাধীনতাসহ সকল মৌলিক অধিকার হনন করে একদলীয় শাসন চালু করার ঘটনায় সাধারণ মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে দিনদিন। তাদের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ। এরকম একটা দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তির আশায় সাধারণ মানুষ ছটফট করছিল। আসলে এই পটভূমিতেই ঘটে যায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনা, বাংলাদেশের রাজনীতিতে যার ফলাফল সুদূরপ্রসারী। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটা কথা বলা হয়ে থাকে যে, অভ্যুত্থানকারীরা সফল হলে জাতীয় বীরের মর্যাদা পায়। আর ব্যর্থ হলে নিন্দিত হয় বিশ্বাসঘাতক হিসেবে। বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতও সে থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আগস্টের (১৯৭৫) সামরিক অভ্যুত্থানের পরপরই ভারতসহ বিশ্বের প্রতিটি দেশ বাংলাদেশের নতুন বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি জানায়, যার নেতৃত্বে ছিলেন মাত্র কয়েকজন মেজর। এটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে, আগস্ট-পরবর্তী ঘটনাবলী, বিশেষ করে সামরিক অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের ঘটনাপ্রবাহই জেনারেল জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে। একবার ক্ষমতায় যাবার পর জেনারেল জিয়ার কাছে আর দ্বিতীয় কোনো বিকল্প পথ ছিল না নিজের ক্ষমতাকে সুসংহত করা ছাড়া। একই সঙ্গে তিনি খালেদ মোশাররফের ক্ষমতাকেও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। জিয়া অত্যন্ত কৌশলী এবং সক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ক্ষমতা সুসংহত করেন এবং যারা পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তুলেছিল, তাদের ক্ষমতাকে খর্ব করেন। তিনি সেনাবাহিনীর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন। একই সঙ্গে তিনি আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরকেও নিজের গণ্ডিতে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। তখন এমনই একটা সময় ছিল যখন দেশের মানুষ আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, জিয়া উদ্যোগী হয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং ১৯৭৫ সালের আগস্ট-পরবর্তী নৈরাজ্য জনিত পরিস্থিতিতে তাঁর উত্থান তাঁকে কেন্দ্র করেই একটি ক্যারিশমার সৃষ্টি করেছিল। জিয়া সাধারণ মানুষের সমর্থন পেয়েছিলেন। এবং তাঁর জনপ্রিয়তা, তার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা এবং সর্বোপরি তার চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সৃষ্টি হয়, যা কিনা আজ বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি স্থায়ী আসন গড়ে নিতে সমর্থ হয়েছে। তবে এটাও সত্য, তার সময়সীমায় রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর পরোক্ষ কর্তৃত্ব ছিল। এই কর্তৃত্বের বলয় থেকে তিনি যখন বেরিয়ে আসতে চাইলেন, তখনই সেনাবাহিনীর এক অংশের হাতে তিনি নিহত হলেন।

www.pathagar.com

জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পেছনে তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদের হাত কতটুকু ছিল তা বরাবরই বিতর্কের সৃষ্টি করে আসছে। কিন্তু জিয়ার হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর প্রতি সাধারণ মানুষের সমবেদনার যে অবিস্মরণীয় বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তাতে করে এরশাদ কিছুটা পিছু হটেন বলে প্রতীয়মান হয়। ক্ষমতা দখলের পরিবর্তে শাসনতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে তিনি সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ১৯৭৫ সালের আগস্টের মেজরদের মতো জেনারেল এরশাদও 'সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা' বজায় রাখতে উদগ্রীব ছিলেন। জিয়ার মৃত্যুর পর রাজনৈতিক নেতৃত্বকেই তিনি ক্ষমতা পরিচালনা করার সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু এরশাদের এই উদ্যোগ ছিল সামরিক ও কৌশলগত। ইত্যবসরে তিনি বেসামরিক আমলাদের সঙ্গে একটা সখ্যতা গড়ে তোলেন এবং আমলাদের মাঝেই তার 'মিত্র'দের খুঁজে পান। সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন জেনারেলরা, যারা এর আগে জেনারেল জিয়ার সামরিক আইনের শাসনামলে ক্ষমতার ভাগ পেয়েছিলেন, তাঁরা জেনারেল এরশাদের পেছনে সমবেত হলেন। এঁরা বিচারপতি সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করেন, যিনি জিয়ার হত্যাকাণ্ডের পর অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, এবং পরে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণ করার পর তিনি সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন অফিসারদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি সেনাবাজেট বৃদ্ধি করেন। ফলে সাধারণ সৈনিকদের মাঝে তাঁর জনপ্রিয়তা কিছুটা বেড়ে যায়। সেনা বাজেট বৃদ্ধি কিংবা সেনাবাহিনীর জন্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর ঘটনা একসময়ের ঔপনিবেশিক দেশগুলোতেও লক্ষ্য করা যায়, যেখানে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছিল। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের মাঝে এই উপলব্ধি বাড়তে থাকে যে, দীর্ঘস্থায়ী সেনাশাসন দেশের রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আদৌ কোনো ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এর ফলে এরশাদের ক্ষমতার ভিত্তি দুর্বল হতে থাকে। এমনি এক পরিস্থিতিতে দেশের ছাত্রসমাজ আবারও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে আসেন। তারা মনে করতে থাকেন ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে তাদের একটি বড় দায়িত্ব পালন করার সময় এসেছে। তারা তৎকালীন এরশাদবিরোধী আন্দোলনের দুই নেত্রী বেগম জিয়া ও শেখ হাসিনাকে একটি প্লাটফর্মে আসতে বাধ্য করে। এবং এরশাদবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার আহ্বান জানায়। যদিও এরশাদবিরোধী এই আন্দোলনের গভীরতা ও বৈশিষ্ট্য কোনোমতেই ১৯৬৯ সালের আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সাথে তুলনা করা যাবে না। আইয়ুব খান ও হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ

www.pathagar.com

উভয়ই ছিলেন সেনাপ্রধান। এবং সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাঁরা ক্ষমতা দখল করেছিলেন। কিন্তু ব্যতিক্রম ছিলেন জিয়া। তিনি সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন জেনারেল হয়েও অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নিজে ক্ষমতা দখল করেননি। এরশাদের বেশ কিছু সমস্যা ছিল, যা আইয়ুব খানের ছিল না। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কোনো পাঞ্জাবী অফিসার ছিল না, যারা বাঙালিদের উপর গুলি চালাতে পারত। সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালি অফিসাররা বাঙালিদের উপর গুলি চালাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। এরশাদ বেশ চতুর ছিলেন, এবং নিজের জীবনকে বিপন্ন করতে তিনি চাননি। তিনি পদত্যাগ করেন।

১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে 'পিপলস পাওয়ার' অন্যতম একটি শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়, যা বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখন এক অনন্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে ১৯৯১ সালে সম্ভবত দেশে প্রথমবারের মতো একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ নির্বাচনে সব ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণিত করে বিএনপি বিজয়ী হয়। যদিও বিএনপির ক্ষমতা গ্রহণের পেছনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকাকে বড় করে দেখা হয়, কিন্তু এটা আমার ধারণা ১৯৯১ সালের নির্বাচনের ফলাফলের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ অতিরিক্ত আস্থাশীল ছিল। কিন্তু তারা নিজেদেরকে তেমনভাবে তৈরি করতে পারেনি। বিএনপি বিজয়ী হলে আওয়ামী লীগ সতর্ক হয়ে যায়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের ব্যাপারে তাদের স্ট্রাটেজি পরিবর্তন করে ও ভুলগুলো সংশোধন করে। তারা পুরো শক্তি নিয়ে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। সংসদে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়। নির্বাচনে সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে এরশাদ ও তার পার্টি শেখ হাসিনাকে সরকার গঠনে সমর্থন করেন এবং এর বিনিময়ে এরশাদ জেল থেকে জামিনে ছাড়া পান। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার পর যে ভুলগুলো করেছিল, ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করার পর সেই ভুলগুলো আবার করতে শুরু করে। বিরোধী মতের প্রতি অসহিষ্ণুতা, বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়নের কারণে বর্তমান সরকার বিতর্কিত হয়। উচ্চ আদালতে তাদের এই অত্যাচার ও নিপীড়নের সমালোচনা করা হয়। ১৯৯৭ সালে বিএনপি দলীয় চারজন সংসদ সদস্যকে হাইকোর্ট থেকে খালাস ও সরকারকে এজন্য এক লাখ টাকা করে জরিমানা এ-কথাই প্রমান করে। যে অভিযোগের ভিত্তিতে সরকার ঐ চারজন সংসদ সদস্যকে গ্রেফতার করেছিল, সরকার হাইকোর্টে তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু হাইকোর্টের এই রায়ের পরেও আওয়ামী নেতৃত্বের মনোভাবের আদৌ কোনো পরিবর্তন হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকার সব ধরনের নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে স্ট্রাটেজিক জায়গাগুলোতে, বিশেষ করে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনে,

www.pathagar.com

তাদের নিজেদের লোকদের নিয়োগ করে। বিশ্ববিদ্যালয় তথা কলেজ ক্যাম্পাসগুলোতে সরকারবিরোধী ছাত্র সংগঠনের কর্মীদেরকে দমন করা হয়। সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে মানুষ বাকশালব্যবস্থার নতুন সংস্করণ দেখতে পায়। কিন্তু আমার বিশ্বাস এটা অব্যাহত থাকলে সরকারের জন্য তা ভবিষ্যতে বুমেরাং হয়ে দেখা দিতে পারে। সরকার গঙ্গার পানি বন্টনে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে চুক্তি করে, তাতে জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তির ফলে দেশের এক-দশমাংশ জায়গা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কাও এক শ্রেণীর মানুষের মাঝে দানা বাঁধছে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ওয়াদাগুলোর মধ্যে টিভি ও রেডিওতে স্বায়ত্তশাসন এবং ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করার ওয়াদা ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ তা পূরণ করেনি। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের ক্ষেত্রেও সরকার উদাসীন। অথচ এই কাজ করতে সংবিধানের সংশোধনের প্রয়োজন নেই মর্মে হাইকোর্ট মত দিয়েছেন। বাংলাদেশের টেলিভিশন মূলত দলীয় মতবাদ প্রচার ও ব্যক্তিপূজার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে চলছে মগজ ধোলাই-এর কাজ। আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হচ্ছে দলীয় লোকদের দ্বারা।

বাংলাদেশের রাজনীতির গত ২৬ বছরে এই যে চিত্র, বিশেষ করে সামরিক অভ্যুত্থান, পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান, রাজনৈতিক সরকার গঠন, রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, তাদের ব্যর্থতা ও দুর্বলতা, এগুলো মূলত দলকে সামনে রেখে করা হয়েছে। কিন্তু দেশ ও জনগণের স্বার্থকে বিবেচনায় আনা হয়নি। রাজনীতিবিদদের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। কিন্তু তা তারা পূরণ করতে পারছেন না। তাঁরা তাঁদের দলীয় স্বার্থ ও সংকীর্ণতার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন। ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্য এই প্রক্রিয়া রাজনীতিতে কোনো ইতিবাচক ফল দেবে না।

ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করা প্রয়োজন বোধ করছি। সেনাবাহিনী বাংলাদেশে একটা সুবিধাভোগী শ্রেণী এবং শক্তিশালীও। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেনাবাহিনীর এই সুযোগ-সুবিধা কর্তন করবেন না। বরঞ্চ সেনাবাহিনীর সঙ্গে যে-কোনো দ্বন্দ্ব তিনি এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করবেন। তিনি ইতোমধ্যে সেনাবাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁর আত্মীয়কে নিয়োগ দিয়েছেন, যা সেনাবাহিনীর মাঝারি ও নিম্নস্তরের অফিসারদের মাঝে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। সেনাবাহিনীতে দলীয়করণ, সেনাবাহিনীতে উচ্চতর পদে নিয়োগের ব্যাপারে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করা, ইত্যাদি প্রতিরক্ষা বিভাগের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সম্পর্কের অবনতি ঘটাতে পারে। তবে এটা সত্য রাজনীতিতে সেনাবাহিনী ততদিন পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করবে না

www.pathagar.com

যতদিন পর্যন্ত না সিভিলিয়ন প্রশাসনের ভেতর তারা একটি মিত্র খুঁজে পায়। কারণ বেসামরিক আমলাদের সমর্থন ছাড়া সেনা-হস্তক্ষেপ কার্যকর হতে পারে না। ১৯৮২ সালে আওয়ামী লীগ এরশাদের সেনা-অভ্যুত্থানকে প্রকাশ্যে সমর্থন করলেও, বিএনপি এই মুহূর্তে কোনো সেনা-অভ্যুত্থানকে সমর্থন করবে না বলেই মনে হয় । আওয়ামী লীগও সেনাবাহিনীকে ক্ষমতাগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাবে না। রাজনৈতিক নেতৃত্ব আজ অনেক বেশি সচেতন ও চালাক। তারা এখন বুঝতে পারছেন যে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করার পর তারা শুধু তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থকেই প্রধান্য করে দেখে। তারা রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আদৌ কোনো পাত্তা দেয় না। গত ২৬ বছরের রক্তাক্ত সংঘাত আর পরিবর্তনের রাজনীতির মধ্যে দিয়ে জনগণ বেশিমাত্রায় সচেতন ও চতুর হয়েছেন। জনগণ ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব এই মুহূর্তে চান না যে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করুক। তবে তাঁরা এটা চান না যে নতুন মোড়কে বাকশাল ধরনের ব্যবস্থা আবারও প্রবর্তিত হোক।

বাংলাদেশের দোরগোড়ায় এখন একবিংশ শতাব্দী। কিন্তু গত আড়াইদশকের যে অস্থিরতায় আবর্তিত ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি তা থেকে উত্তরণের কোনো আলামত দেখছি না। রাজনৈতিক দলগুলো 'রুলস অব গেম' মেনে চলছে না। স্বাধীনতার পর পরই আমরা দেখেছি কিভাবে ডাকসুর নির্বাচনে ভিন্নমতাবলম্বীদের জয়ের পর পেশীশক্তি দিয়ে তা পর্যুদস্ত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় তছনছ করার সে নির্দেশ এসেছিল কিন্তু সেদিন হাইকমান্ড থেকেই। ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে গণভোট অনুষ্ঠানের যে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন তা খড়কুটোর মতো ভেসে যায় ক্ষমতার রাজনীতির স্রোতে। এটা ঠিক যে, ক্ষমতার বাজি অত্যন্ত চড়া। কিন্তু লোভ তো সংবরণ করতে হবে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দলের উপর স্থান দিতে হবে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রক্রিয়াকে। অপ্রিয় হলেও বলতে হয়, বাংলাদেশের রাজনীতিকগণ যদি ক্ষমতার মোহ পরিত্যাগ না করেন এবং 'রুলস অব গেম' না মেনে চলেন তবে একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশেও গত ২৬ বছরের দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকবে। এবং এদেশের সাধারণ মানুষের জন্য তা হবে সবচেয়ে বড় বিড়ম্বনাকর।

www.pathagar.com

নারী ও রাজনীতি ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ডঃ নাজমা চৌধুরী *

আমরা আশি-নব্বইয়ের দশকে যে পর্বটা পার হয়ে এসেছি সেখানে নারী আন্দোলনের বক্তব্য ছিল নারীর ক্ষমতায়ন, নারীকে সমতার পর্যায়ে আনা এবং নারীর ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে কিছু কলাকৌশল নির্মাণ করা। চূড়ান্ত পর্যায়ে নারীর উন্নয়ন ও সমতার লক্ষ্যে বেইজিং-এ যে সম্মেলন হয়েছে তার প্রস্তুতির আলোকে চিহ্নিত করেছি যে, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য রাজনীতিতে অংশগ্রহণ একটি অপরিহার্য শর্ত। রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রস্তুতিপর্ব হয় চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে, যাকে আমরা বলি জাকার্তা সম্মেলন। জাকার্তা সম্মেলনে নারীর অসমতার একটি ক্ষেত্রকে রাজনৈতিক এবং অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসমতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং তা উত্তরণের লক্ষ্যে নানা কৌশল বিধৃত করা হয়।

আজকে কতগুলো বিষয়ের দিকে আমাদের মনোযোগ দেওয়া দরকার; যেমন নারীর প্রতি বৈষম্য অপনোদনসংক্রান্ত দলিল পূর্ণ বাস্তবায়নের কথা জাকার্তা সম্মেলনে বলা হয়েছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে তা পূর্ণ সমর্থন না পেলে নারীর অধিকার রক্ষিত হচ্ছে না। রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত ও নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এবং দলীয় সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর সংখ্যা স্বল্প। বেইজিং ঘোষণায় নারীর ক্ষমতায়ন ও তার নিজের জীবনের ওপর নিজের এখতিয়ার এবং নারীস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সর্বক্ষেত্রে, বিশেষ করে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সমঅংশগ্রহণ একটি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত।

আমরা যে কত পিছনে আছি তার একটি পরিসংখ্যান দেয়া যেতে পারে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ১৯৯০ সালে নির্ধারণ করেছিল, ১৯৯৫ সালের মধ্যে আইন পরিষদ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশ্বব্যাপী ৩০% নারী অবস্থান করবেন। কিন্তু বেইজিং সম্মেলনে দেখা গেল আমরা অনেক পেছনে পড়ে আছি। সেজন্যই জাকার্তা সম্মেলনের প্রস্তুতি প্রক্রিয়ায় এ টার্গেট ঠিক করা হয়েছিল ২০%। বিভিন্ন ধরনের কলাকৌশল এই দু'টি ডকুমেন্টে বিবৃত আছে। আমি সেখান থেকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য ৪টি বিষয়ের একটি গুচ্ছ এখানে উল্লেখ করেছি। বিভিন্ন ডকুমেন্টে বহু কৌশল বিবৃত হয়েছে। বাংলাদেশে নারী আন্দোলনেও বহু কৌশল গৃহীত হয়েছে। কিন্তু

---

* প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

আমি এখানে ৪টি ইস্যুকে একত্রিত করে একটি কাঠামো তৈরী করব। এই ৪টি ক্ষেত্রে যদি আমরা নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে পারি বা এসব ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ সক্রিয় হয়ে উঠবে। এ ব্যাপারে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজনীতির অঙ্গনে নারীর কিঞ্চিৎ শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে। আশির দশক থেকে নব্বইয়ের দশকে প্রার্থিতা বেড়েছে। এক ব্যক্তি একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও তুলনামূলকভাবে প্রার্থিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১-এর ফেব্রুয়ারি এবং ১৯৯৬-এর জুন মাসের নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণের হার এবং প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী এলাকায় তাদের অবস্থান প্রায় সমপর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু কত দুর্বল, কত অসংহত অবস্থানে যে নারীরা রয়েছে, সাধারণ নির্বাচনগুলোতে তাদের প্রার্থিতার তুলনামূলক হার দেখলে তা বোঝা যায়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে মোট নারীপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১.৫ অংশ। জুন '৯৬-এর নির্বাচনে তা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১.৯-এ। এর আগে '৮৬-র নির্বাচনে ছিল ১.৩ এবং বাদবাকি নির্বাচনগুলোতে নারীরা মোট প্রার্থীর ১ শতাংশও ছিলেন না। সুতরাং নারী আন্দোলনের দাবি ছিল, প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির অঙ্গনে নারীর অংশগ্রহণ সংখ্যাগত দিক থেকে বৃদ্ধি করা হোক এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী কোনো কোনো দেশের মতো রাজনৈতিক দলগুলো ঘোষণা দিক যে, তারা ন্যূনতম হারে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় নারীকে সংসদে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেবে। এটাও আশা করা হয়েছিল যে, কোনো একটি দল এভাবে এগিয়ে এলে নারীর কাছে ভোটের আবেদন পৌঁছানোর জন্য অন্যান্য দলও এই ধরনের একটি ঘোষণা নিয়ে এগিয়ে আসবে। তারাও ন্যূনতম একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা স্থির করে দেবে। তবে আমরা জানি, নির্বাচনী রাজনীতিতে সাধারণ আসনে নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নে বিভিন্ন নির্ণায়ক ক্রিয়াশীল থাকে, যার মাধ্যমে মনোনয়ন হয় সুনিশ্চিত। সাধারণত দেখা যায় স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় সংগঠনে বা দলীয় এলাকায় আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যাঁদের জাতীয় পর্যায়ের নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং কার্যকর যোগাযোগ বা যোগসূত্র রয়েছে, যাঁরা নির্বাচনী প্রচারণাকালে পর্যাপ্ত এবং সক্রিয় দলীয় সমর্থন আদায় ও ব্যবহারে সক্ষম এবং যাঁদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান এবং সম্ভাব্য উৎসের প্রাচুর্য রয়েছে তাঁরাই মনোনয়ন লাভ করতে সক্ষম হন। এছাড়া রাজনৈতিক শক্তি বিস্তারের সহায়ক হিসেবে মাস্তান, অস্ত্র ও পেশিশক্তিও চিহ্নিত হয়েছে। সুতরাং, নারীর পক্ষে রাজনৈতিক শক্তি ও সামর্থ্যের উপাদান সঞ্চয়ে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো সে জন্যই নারীকে নির্ভরযোগ্য প্রার্থী হিসেবে মনে করে না। তারা

www.pathagar.com

মনে করে না যে, নারী আসনটি জয় করে নিয়ে আসতে পারবে। এমনকি আমরা দেখি যে, রাজনীতর অঙ্গনে বিচরণ করেছেন এরকম নারীও বলেছেন যে, মনোনয়নে বা নির্বাচনে তাঁদের পক্ষে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব নয়। তাঁরা সংরক্ষিত আসনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এবারের সংসদ নির্বাচনের একটি চিত্র উল্লেখ করা যেতে পারে। সপ্তম সংসদ নির্বাচনে ৩৬ জন নারী প্রার্থী ছিলেন। একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য সর্বমোট নারীপ্রার্থিতা দাঁড়ায় ৪৮ এ। নির্বাচনী এলাকা মোট ৪৪টি। ১১টি আসনে তাঁরা জয়যুক্ত হন। অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী আসনের ২৩ শতাংশ তাঁরা লাভ করেন। তবে বস্তুতপক্ষে ৫ জন নারী সাংসদ হন। এ ছাড়া আরও ৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁরা দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন। বিজয়ী প্রার্থীর সঙ্গে দুটি নির্বাচনী এলাকায় তাঁদের ভোটের ব্যবধান ছিল নিতান্তই নগণ্য। এ থেকে বোঝা যাবে নারীপ্রার্থীরা যে ভোট পেয়েছেন সেটা খুব খারাপ ভোট নয়। নারীপ্রার্থীদের মধ্যে ৩০ জন প্রার্থীর জামানত-বাজেয়াপ্ত হয়েছে। তবে মজার ব্যাপার হল, এঁরা প্রায় সকলেই প্রদত্ত বৈধ ভোটের ১ শতাংশের নিচে ভোট পেয়েছেন। তুলনা করলে দেখা যাবে, যাঁদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে তাঁরা মোট নারীপ্রার্থীর ৬২.৫ শতাংশ। পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ২৫২৬ জন। তাঁদের মধ্যে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে ১,৭৩০ জনের, অর্থাৎ ৬৮.৫ শতাংশ। নির্বাচনী বাস্তবতার অবশ্যই বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে এবং বিশেষ প্রবণতার দিকেও এসব তথ্য ইঙ্গিত করছে। তবে এই পরিসংখ্যান অন্তত এটুকু প্রমাণ করে যে, নারী প্রার্থীরা তুলনামূলকভাবে নিজেদেরকে খারাপ ঝুঁকি বলে প্রমাণ করেননি।

আরেকটি দিকে দৃষ্টি দেয়া যায়। ৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ১৫টি আসনের উপনির্বাচনে দুজন নারীপ্রার্থী জয়ী হয়েছেন। এঁরা দুজন সাংসদের স্ত্রী। কোনো রাজনীতিকই চাইবেন না একটা নিরাপদ নির্বাচনী এলাকা তাঁর দলের বাইরে চলে যাক। সুতরাং, সম্ভাব্য একজন নিরাপদ ব্যক্তিকে সেই রাজনৈতিক দল থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। আগে প্রাথী হিসেবে আসতেন প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিকদের চাচা, মামা, ভাতিজা, ও পুরুষ শিষ্যরা। সেখানে এখন রাজনীতির অঙ্গনে তাঁদের স্ত্রী, কন্যা, বোনেরা আসতে শুরু করেছেন। এটা মেয়েদের রাজনীতিতে আসার প্রকৃষ্ট পথ নয়। তাঁদের নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করা দরকার। পাশাপাশি অবশ্য এও আমরা বলতে চাই, এ ঘটনা প্রমাণ করছে যে, নারীরা তাঁদের রাজনৈতিক গুরুত্ব বাড়াতে পেরেছেন, তা তাঁরা যাঁর স্ত্রী, কন্যা বা বোনই হোন না কেন। রাজনীতিকের স্ত্রী হিসেবে মনোনয়নটি পেয়েও তিনি সেটা রাখতে পারছেন নিজের জন্য, নিজের পরিবার ও নিজের দলের জন্য।

এছাড়া সকল রাজনীতিক নারীর কাছে নারীসমাজের প্রত্যাশা এই যে, রাজনীতির

www.pathagar.com

অঙ্গনে তাঁদের উপস্থিতি নারীর জন্য মঙ্গলজনক হবে, বিশ্বকে তাঁরা নারীর চোখে দেখবেন এবং অপরকে দেখতে অনুপ্রাণিত করবেন। যাঁরা রাজনীতির অঙ্গনে বিচরণ করছেন এবং নিজদের দলে বিভিন্ন অবস্থানে আছেন সেখান থেকে অন্য নারীদের তাঁরা রাজনীতিতে উর্ধ্বগামিতার পথে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবেন।

১৯৮৭'র ডিসেম্বরে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। '৯০ সালের সংসদে দশম সংশোধনীতে ১০ বছরের জন্য আগের মতো ৩০টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। ১৯৯০ সালের দশম সংশোধনীতে বলা হয়, পরবর্তী সংসদ থেকে এ ব্যবস্থা কার্যকর হবে এবং তা ১০ বছর স্থায়ী হবে। '৯০-এর গণআন্দোলনের মুখে পূর্বতন সরকারের পতন ঘটলে '৯১ সালে ৫ম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে সংসদে নারীর জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসন পুনরায় সংযোজিত হয়। এই ব্যবস্থা সংবিধানের ধারা অনুযায়ী কার্যকর থাকবে ২০০১ সাল পর্যন্ত।

ইস্যুটা আমরা এখন সামনে নিয়ে আসতে চাই। ২০০১ সালের মধ্যে আমাদের এমনকিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে, রাজনীতিতে নারীদের শক্তিসঞ্চালনের জন্য যা উপযুক্ত হবে। আমাদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রথমে মনোনয়ন পদ্ধতি এবং পরে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। নীতিনির্ধারণী মহলে, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এবং নির্বাচন কমিশনে যাঁরা আছেন তাঁদের এখন ভেবে দেখতে হবে সংরক্ষিত আসনে নারীদের জন্য নির্বাচনের যে পদ্ধতি আছে তাকে সাধারণ নির্বাচনের মতো কীভাবে জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায়। একথা বলা যায় যে, সংরক্ষিত আসনে প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি নারীর রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয়ের সহায়ক হয়নি। বরং তাদের স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে পুরুষ নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল হতে হচ্ছে। অবশ্য সাধারণ আসনে নির্বাচনের জন্য নারী রাজনীতিক এখন প্রস্তুত কি না তা এখনও চিন্তাভাবনার বিষয়। সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন করতে হলে নির্বাচন কমিশন, সুশীল সমাজের বিভিন্ন অংশ, রাজনৈতিক দল, সরকার, নীতিনির্ধারণী মহল–সব জায়গাতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। সংরক্ষিত আসন যদি রাখা হয় তবে তা অবশ্যই সরাসরি হতে হবে। আমরা পত্রপত্রিকায় দেখেছি ভারতীয় পার্লামেন্টে ৩৩ শতাংশ নারীআসন সংরক্ষণের দাবি উঠেছে। অনেক দেশে সংরক্ষিত আসনের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোও নারীদের জন্য একটা নির্দিষ্ট কোটা রাখে। সেটা রাখা যায় কি না তাও বিবেচ্য বিষয়। নির্বাচনী ব্যয় এবং অন্যান্য যে-অনভিপ্রেত ইস্যুগুলো নির্বাচনে প্রভাব ফেলে, সেগুলো বন্ধ করার জন্য নির্বাচনী আচরণবিধির প্রতি আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। আচরণবিধির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

www.pathagar.com

এবার আসা যাক দ্বিতীয় ইস্যুতে। এ ইস্যু রাজনৈতিক দল ও নারী ইস্যু। ক্ষুদ্রপরিসরে পরিচালিত জরিপভিত্তিক তথ্য এবং সংবাদপত্রের বিবরণ থেকে আমরা দেখতে পাই, এবার নারীরা নজিরবিহীনভাবে অধিকহারে ভোটদান করেছেন। নারী আন্দোলনে একটা কথা মাঝে মধ্যে ওঠে যে, রাজনৈতিক দলে মহিলা শাখা থাকলে দলীয় সংগঠনের নারীরা প্রান্তিকতায় বাঁধা পড়ে যায়। দলের সাংগঠনিক কাঠামোর মূল স্রোত থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন বা নিষ্ক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দলের শ্রমিকফ্রন্ট বা অন্যান্য ফ্রন্টের মতো গুরুত্ব অর্জনে মহিলা শাখা ব্যর্থ হয় বলে মনে করা হয়। তবু যে সব দলের মহিলা শাখা রয়েছে তাদের মাধ্যমেও নারী ভোটারদের কাছে পৌঁছান যায়। নারী সংগঠনের মাধ্যমেও নারী ভোটারদের আকর্ষণ করা যায়।

রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে নারীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, নির্বাচনী মেনিফেস্টোই একটি রাজনৈতিক দলের আদর্শিক দায়বদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ। এর মাধ্যমেই দল নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে স্বীয় আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশে নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর রাজনীতি এসমস্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয়াবলি ঘিরে খুব কমই আবর্তিত হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো নারী সম্পর্কে যে অঙ্গীকার করে সেগুলো তাদের আদর্শের বহিঃপ্রকাশ ধরে নিলেও সেগুলো তারা যথাযথভাবে পালন বা বাস্তবায়ন করছে কি না তাও দেখার সময় এসেছে। এবারকার নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৪/৫টি দলের মেনিফেস্টোতে দেখা যাবে নারীসমাজ এবারও প্রায় আলাদাভাবে এসেছে। নারী উন্নয়নের দর্শন ও কলাকৌশলকে রাজনৈতিক মূল স্রোতের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। স্রোতের মধ্যে প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর না করতে পারলে নারী সমতার পর্যায়ে পৌঁছাবে না। এবার কোনো কোনো দলের মেনিফেস্টোতে নারীসমাজের জন্য কিছুটা বিস্তৃত কর্মসূচি থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীসমাজকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়েছে। রাজনৈতিক দলের জবাবদিহিতা যদি নারী ভোটার ও সংসদের কাছে রাখতে হয় তা হলে নির্বাচনে প্রদত্ত ঘোষণা বাস্তবায়িত হল কি না তার মনিটরিং এবং ভোটার সচেতনতার দায়িত্বে নিয়োজিত নারী সংগঠনগুলোকে এ ব্যাপারে একটা ভূমিকা পালন করতে হবে। অনেক সময় নারী সংগঠনগুলো সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও আলোচনা সভার মঞ্চ থেকে আহবান করেছে যে, নারী সাংসদরা সুনির্দিষ্ট নারীইস্যুতে একত্রিতভাবে তাঁদের দলীয় নীতির উর্ধ্বে উঠে অবস্থান নেবেন।

নারী সাংসদ, নারী রাজনীতিক, মিডিয়া ইত্যাদি সকলকে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার কতদূর বাস্তবায়িত হল তা দেখার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিগত বিশ্ব-

www.pathagar.com

সম্মেলনগুলোতে, যেমন ধরিত্রী বিশ্বসম্মেলন, আইসিপিডি, সোশ্যাল সামিট এবং বেইজিং কনফারেন্স ইত্যাদিতে সিভিল সোসাইটির মনিটরিং-এর প্রশ্নটার ওপরে বেশি জোর এসেছে।

তৃতীয় ইস্যুটি হচ্ছে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন সনদ বা সিডো সম্পর্কে আলোচনা। এটি বারবারই জাকার্তা এবং বেইজিং ডকুমেন্টে এসেছে। রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদনের লক্ষ্যে এই দলিল বা সনদ ডিসেম্বর, ১৯৭৯তে জাতিসংঘে গৃহীত হয়। ৩ সেপ্টেম্বর '৮১ সালে এ দলিল প্রণীত হয়। এটাকে নারীর আন্তর্জাতিক বিল অভ রাইটস বলা হয়। এ পর্যন্ত মোট ১৪০টি রাষ্ট্র এ দলিল অনুমোদন করেছে। কেউ কেউ আবার কোনো কোনো ধারা সংরক্ষণ করেছেন। সেটার অধিকার রাষ্ট্রের আছে। বাংলাদেশ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা সংরক্ষণসহ এ দলিল অনুমোদন করেছে ১৯৮৪ সালে। এই সনদ বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্বাক্ষরদানকারী রাষ্ট্রের। তারাই এই সনদের রাষ্ট্রীয় পক্ষ। ৩০টি ধারার বিস্তারিত বিবরণে আমি যাব না। এখানে যে ধারাগুলোকে বাংলাদেশ সরকার সংরক্ষণ করেছে, তার মধ্যে আছে ধারা ২। বস্তুতপক্ষে সনদটাকে বাস্তবায়ন করার পদ্ধতি এই ধারাটি নিরূপণ করেছে। সুতরাং এ ধারা সংরক্ষণ করে অন্যান্য ধারায় সম্মতিজ্ঞাপন অনেকটা অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানেই নারী-পুরুষ সমঅধিকার স্বীকৃত। উপরন্তু নারী সমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের কথাও লিপিবদ্ধ রয়েছে।

ধারা ১৩ ক বাংলাদেশ সরকার সংরক্ষণ করেছে। সেখানে পারিবারিক সুবিধাদিতে সমঅধিকার ও নারী-পুরুষের সমঅধিকারের কথা রয়েছে। এখন পারিবারিক সুবিধার দুই ধরনের ব্যাখ্যা থাকতে পারে। একটা হল রাষ্ট্র কর্তৃক পরিবারকে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা, দ্বিতীয়টি হল পরিবার কর্তৃক সঞ্চিত বা সঞ্চয়কৃত সুবিধা-এর মধ্যে উত্তরাধিকারের ধারণা সুপ্ত থাকতে পারে। রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধার উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বাংলাদেশে সরকার শিক্ষার অগ্রগতির জন্য পরিবারের কন্যাশিশুকে শিক্ষার অঙ্গনে নিয়ে আসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে জনগণ যে সুবিধা পাচ্ছে সেটা নারীর পক্ষেও যেতে পারে। এই ধারণায় আমরা অভ্যস্ত হচ্ছি। ফলে এ ধারার সংরক্ষণ এখনকার প্রচলিত বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খায় না।

ধারা ১৬ এর উপধারা ১ এর গ এবং চ-এ দুই ধারায় বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদের সমান অধিকার নারীকে অর্পণ করেছে এবং সন্তানের অভিভাবকত্ব, সন্তান দত্তকগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে নারীকে অধিকার দেওয়া আছে। অবশ্য বাংলাদেশ সরকার শরিয়া আইনের

www.pathagar.com

পরিপন্থী বিবেচনা করে এই ধারা-উপধারাগুলো সংরক্ষণ করেছে। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে এই সনদে তিনটি সংরক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ওআইসির তালিকার কোনো কোনো রাষ্ট্র অনুরূপ ধারায় আমাদের সরকারের মতো সংরক্ষণ করেছে, তবে ২ এবং ১৩ এ সংরক্ষণ পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে খুবই কম। ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬-এ সনদ প্রবর্তন করার ১৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে নারী আন্দোলনগুলো অনেক কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছিল। এই ধারাসমূহের সংরক্ষণের প্রত্যাহার, স্বীকৃত ধারাসমূহের বাস্তবায়ন এবং জাতিসংঘ থেকে অপশনাল প্রটোকল প্রবর্তন করার জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাতে সম্মতি প্রদান করা হোক, এই দাবি বর্তমানে উচ্চারিত হচ্ছে।

চতুর্থ ইস্যুটি হল প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কাঠামোয় নারী। মনে হতে পারে প্রসঙ্গটি হয়তো বিচ্ছিন্ন। ধারণা হতে পারে যে, রাজনীতি আর প্রশাসন তো এক জিনিস নয়, তাদের সম্পৃক্ততা কোথায়। কিন্তু এটা এখানে নিয়ে আসার কারণ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পরিসরে আলোচনায় রাজনীতিতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কাঠামোয় নারীর অংশগ্রহণে সমস্যা ও সমাধান হিসেবে একত্রে আলোচিত হয়েছে। তবে দুটোর ভিন্নতা রয়েছে। দুটোর মাপকাঠিও ভিন্ন। কিন্তু দুটোর মিল একটা জায়গায় যে রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়ন করা হয় এ-দুটি জায়গা থেকেই। রাজনীতির নেতৃত্বে এবং প্রশাসনিক ঊর্ধ্বতন কাঠামো থেকে নীতি প্রণীত হয়। এ ছাড়া রাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত মূল চাবিকাঠি নিয়ন্ত্রিত হয় এখানেই। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা, নারী-পুরুষ সমতা, নারী-প্রেক্ষিত সংযোজন এসবের জন্যও রাষ্ট্রের অর্ধেক নাগরিক নারীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কাঠামোয় উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর স্বল্প উপস্থিতি একটি সামাজিক প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ এসেছে। কেননা, নারী উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশ করেছে দেরিতে। পেশার দ্বার তাদের জন্য দেরিতে খুলেছে। বিভিন্ন পেশায় নারীর সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাও দেরিতে এসেছে। সমাজ নারীর প্রতি বৈষম্য করেছে। সামাজিক মূল্যবোধ পুত্র ও কন্যাকে একই মাত্রায় দাঁড় করাতে পারেনি। সুতরাং বিভিন্ন পেশায় নারী এখন নিম্ন পদসোপানে অবস্থান করছে। প্রশাসনের ঊর্ধ্বপদেও মূলত এই কারণেই নারীর অবস্থান সীমিত। বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে যদি ত্বরিত গতিতে এ শূন্যস্থান আমরা পূরণ করতে চাই তা হলে নীতিনির্ধারণী মহলের দায়বদ্ধতা প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রশাসনকাঠামোয় সম্ভবত ৬৪ জন সচিব রয়েছেন। তার মধ্যে একজন নারীও নেই। আনুমানিক ৬০ জন অতিরিক্ত সচিবের মধ্যে অতি সম্প্রতি পদোন্নতিপ্রাপ্ত একজনসহ মোট রয়েছেন দুজন নারী। যুগ্মসচিবের পদে আনুমানিক ২৪০ জন পুরুষ ও ৩ জন

www.pathagar.com

নারী। সামগ্রিকভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণের এই চারটি স্তর নিয়ে প্রায় ১.২ শতাংশের কাছাকাছি নারী রয়েছেন। এ অবস্থা বদলানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন। না হলে আগামী দুই দশকেও নারীর উপস্থিতি কোনো উল্লেখযোগ্য অবস্থানে আসবে না। বলা হয়ে থাকে, কোনো কর্মক্ষেত্রে নারীকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে হলে অথবা পরিবর্তনের বাহক হতে হলে তাঁদেরকে সেখানে একটি ক্রিটিক্যাল মাস হতে হবে। ক্রিটিক্যাল মাস-এর এই তত্ত্ব যারা দেন, তারা এর মাত্রা ৩৩ শতাংশ নিরূপণ করেন। এমন একটা অনুপাত হলে তবেই নারীরা পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন এবং অবদান রাখতে পারবেন। সুতরাং নীতিনির্ধারকদের সামনে এখন দুটি পথ খোলা। প্রথমটি হল পদোন্নতির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মে পদসোপান পেরিয়ে যোগ্যতার ভিত্তিতে কোনো কোনো নারী উর্ধ্বতন পদে উন্নীত হবেন। দ্বিতীয় পন্থা হল সক্রিয় উদ্যোগ বা প্রো-অ্যাকটিভ ইনিশিয়েটিভ।

উচ্চতর পদগুলোতে নারীর উল্লেখযোগ্য অবস্থান অবশ্যই একধাপে হয়ে যাওয়ার নয়। নীতিগত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ২০০০ সালকে সামনে রেখে সেটা পর্যায়ক্রমে করতে হবে। নারীর অগ্রগতি ও সমতার পক্ষে বিশেষ ব্যবস্থাকে গ্রহণ করার এখতিয়ার বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রকে প্রদান করেছে। নীতিগত সিদ্ধান্তের পূর্বশর্ত হল রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃঢ় প্রত্যয় ও দায়বদ্ধতা। বেইজিং-উত্তর পটভূমিতে নতুন শতাব্দীতে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে সরকার সক্রিয় প্রো–অ্যাকটিভ পদক্ষেপ নিতে পারে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনায় এবং রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে নারীর দাবী এবং নারীর দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সংশ্লিষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

www.pathagar.com

বর্তমান বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় প্রতিরোধে ইসলামী বিকল্পঃ একটি প্রাথমিক টীকা

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী*

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বোয়ানির রাজীম
বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

চলতি আবহঃ নিষ্পিষ্ট মানবতা

বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে শুরু হয়ে চলতে চলতে এ রাষ্ট্রের, সমাজের, জনজীবনের অবক্ষয় আজ চরমাকার ধারণ করেছে। সংকট, বন্ধ্যাত্ব, অচলায়তন এখানে আজ সর্বাধিক বড় সত্য। বিশ্বাসঘাতকতা, আস্থাহীনতা, নোংরামি-নীচুতা, চুরি-চামারি, লুটপাট-ছিনতাই, ডাকাতি-রাহাজানি, জ্বালাও-পোড়াও, ধর্ষণ-হত্যা, এসিড নিক্ষেপ-গুম, খুন এখানে প্রতিনিয়ত সর্বত্র চলছে। এখানে রাজনীতি-রাষ্ট্র পরিচালনা চরম মাত্রায় সুবিধাবাদ, মিথ্যাচার, ভন্ডামী, বেঈমানী, আত্মস্বার্থ, আত্মসাৎ, লুট-লুচ্চামি দ্বারা শোভিত। সংবিধান এখানে শাসকের পদতলে পিষ্ট। শাসকগোষ্ঠী ও সরকার এখানে দায়-দায়িত্বহীন, তস্কর, লুটেরা। মিথ্যাচার, ভ্রষ্টাচার, প্রতারণা, কূট-কৌশল, মুনাফিকী, আত্মসাৎ ইত্যাদির সাথে সাথে অশিক্ষা-অর্ধশিক্ষা, অজ্ঞতা, জিদ, বাইরের প্রভুর পদলেহন, স্রেফ-গুন্ডামি এখানে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী ও সরকারী নেতৃত্বের বাস্তব বৈশিষ্ট্য, অনিবার্য চরিত্র। পরিকল্পনাহীনতা, দূরদৃষ্টিহীনতা, লজ্জাজনক স্বজনতোষণ, চরদখলকারী মস্তানি ইত্যাদি শাসক ও সরকারী নেতৃত্বের ভূষণ। এদের বিরোধী পক্ষরাও এসব বৈশিষ্ট্য ধারণ করেন এবং চরম দায়িত্বহীনতা, সুবিধাবাদিতা ও স্বার্থপরতার পরিচয় দেন।

বাংলাদেশে আজ রাষ্ট্র, সরকার, সংবিধান, বিচারালয়, শাসন, প্রশাসন, শিক্ষায়তন, প্রচার মাধ্যম, প্রেস, ক্রীড়াজগৎ, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, প্রতিরক্ষা কাঠামো, পুলিশ, সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় কেন্দ্র সবকিছুতে ধস্ নেমেছে। অসততা, মিথ্যাচার, দখলপ্রবণতা, সুবিধাবাদিতা, হাওয়া বুঝে পাল খাটানো, তস্করবৃত্তি, গুন্ডামি, পদলেহন, দায়িত্বে ও কর্মে ফাঁকি, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, লক্ষ্যহীনতা--এসব কিছু সর্বত্র প্রবলতম মাত্রায় দৃশ্যমান এবং এসবই প্রতিটি কাঠামোর পরিচালনাকারী ও নিয়ন্ত্রক শক্তি।

---

* প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

ফলে সবকিছু ভেঙ্গে পড়েছে ও পড়ছে। উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, পরিকল্পনা, দূরদৃষ্টি, দায়িত্ব সচেতনতা, উপলব্ধি, করণীয়, কর্মকুশলতা স্ব-নিয়ন্ত্রণ, সমঝোতা, সহযোগিতা, সততা, নিষ্ঠা, সংহতি ইত্যাদি যা কিছু শুভ, ভাল, কল্যাণকর, ন্যায্য, সুস্থ, স্বাভাবিক, সঙ্গত, রুচি-নির্ভর, ইতিবাচক, সভ্যতা নির্মাণকারী--সবকিছু আজ অপসৃত, উধাও।

বাংলাদেশে আজ অর্থনীতি বিধ্বস্ত, রাজনীতি বিনষ্ট, রাষ্ট্র পরিচালনা দিক-নির্দেশনাহীন, সংবিধান পিষ্ট ও পরিত্যক্ত, সরকার অসততা-মিথ্যাচার-অযোগ্যতায় ঠাসা, সংসদ ভাঁড়ামির কেন্দ্র ও টকিং শো-তে রূপান্তরিত। সততা, চরিত্র ও নৈতিকতার আজ কোনোই দাম নেই। এখানে শাসক-প্রশাসক উৎকোচ-ঘুষে ডুবে আছে, আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। নির্বাচিত প্রতিনিধি কেবল মাখন উদরস্থ করছে। ক্ষেত্র বিশেষে বিচার কাঠামো দুর্নীতি, ব্যর্থতা, প্রহসনের প্রাবল্যে বিধ্বস্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমলারা আত্মসাৎ, দখল, স্বজনপ্রীতি ও দায়িত্বহীনতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং দলীয় সরকারের লেজুড় আর রাজনৈতিক চাঁই হওয়ার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। প্রায়শই ব্যবসায়ীরা স্মাগলিং-এ এবং ক্রেতাদের পকেট কাটায় ব্যস্ত। অনেকক্ষেত্রে শিল্পপতিরা শর্টটার্ম রিটার্ন ও ঋণখেলাপী কালচারের প্রবক্তা। প্রচারমাধ্যম ব্যক্তিপূজা, নির্লজ্জ দালালী, অশ্লীলতা ও অযোগ্যতায় ডুবে থেকে ও ডুবিয়ে দিয়ে আত্ম আখের সন্ধানে তৎপর। অনেক ক্ষেত্রেই পত্র-পত্রিকা ও সাংবাদিকতা দালালী, টোপ গেলা, হলুদ সাংবাদিকতা, চরম নীতিহীনতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আজ ভাঁড়, মিথ্যুক, প্রবঞ্চক, সুবিধাবাদী তস্কর। রাজনৈতিক কর্মী আজ হালুয়া-রুটির সন্ধানে ব্যস্ত। অনেকক্ষেত্রে শিক্ষক আজ অশিক্ষা দিচ্ছে, ভেট গিলছে; শিক্ষা প্রশাসক হচ্ছে দলীয় দালাল। অনেকক্ষেত্রে ছাত্ররা বদমাশী এবং নোংরামিতে ব্যস্ত, নকলে ও শিক্ষা-বহির্ভূত দুষ্কর্মে লিপ্ত। ধর্মবেত্তারাও ক্ষেত্রবিশেষ নিজেদের বিক্রি করছেন; হাওয়া বুঝে পাল খাটানো তাদেরও নীতি। সমাজের সর্বত্র তাই মস্তানচক্র, পেশাদার গুণ্ডা, ভাড়াটে খুনী, অস্ত্রবাজ চরদখলকারীর উদ্দাম নৃত্য চলছে; রমরমা অবস্থা আজ তাদের। ব্যক্তিগত ক্রোধ মেটানো, জায়গা দখল, মাঠ ও মঞ্চ দখল, জনসভা দখল ও ভণ্ডুল করা, ধর্ষণ-খুন-গুম সব কাজে তারাই কাজী। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষীবাহিনী আজ সর্বাধিক ঘুষখোর, যেমন–শুল্ক, আয়কর, আমদানি-রপ্তানি, পূর্তসহ অন্যান্য ক্ষেত্রও ঘুষে নিমজ্জিত। অনেকক্ষেত্রে পুলিশ আজ হাইজ্যাকার বা ছিনতাইকারী, পুলিশ আজ ধর্ষণকারী, পুলিশ আজ খুনী। অনেকক্ষেত্রে রিকশাচালক আজ ড্রাগ এডিক্ট ও অত্যাচারী। অনেকক্ষেত্রে নারী স্বাধীনতার প্রবক্তা আজ গণিকার ভূমিকায়। প্রায়শই দোকানদার ও বিক্রেতা আজ ভেজাল মিশিয়ে ক্রেতা মারছে। ন্যায়নিষ্ঠা, সুবিচার, দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা,

www.pathagar.com

কর্মতৎপরতা আজ কোথাও নেই। মদপান, মাদক দ্রব্যাদি গ্রহণ, চোরাচালান, ঘুষ, ভেজাল, অপহরণ, নির্লজ্জতা ও উলঙ্গপনা, ধর্ষণ, সংস্কৃতির নামে বাচালতা-অজ্ঞতা-বেহায়াপনা-খিস্তি চলছে। সভ্যতাকে আর রুচিকে গলা টিপে মারা হচ্ছে। সংস্কৃতিসেবী, নাট্যকর্মী, অভিনেতা–অভিনেত্রী, প্রযোজক-পরিচালক, রেডিও-টিভি নিয়ন্ত্রক, সংবাদপত্রের মালিক--সবাই আজ চরিত্র বিকিয়ে দিয়ে একেবারে দিগম্বর। দেশ যেন আজ এক নোংরা ভাগাড়। এখানে কোনো কিছু স্বাভাবিক ও সুস্থ নেই। অসুস্থতা ও বিকারই আজ স্বাভাবিক। দেশ নামক ভাগাড়ে আজ শকুন, শৃগাল, সারমেয়, শাখামৃগ ও বরাহদের অস্তিত্ব প্রবলতম। চলছে তাদের উদ্যেম নৃত্য, উলঙ্গ লুটতরাজ। অসহায় আজ সাধারণ মানুষ। সৎ, যোগ্য, নিষ্ঠাবান, চরিত্রবান, সংযমী, কর্মী, সহযোগী, চিন্তক, পরিকল্পক, দূরদর্শী এবং সরল মানুষেরা আজ নিষ্পিষ্ট, দিশেহারা।

সমস্যা কোথায় ঃ কোন বিবরে

ঔপনিবেশিক ও গতানুগতিক সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামো; অনুপযোগী ও ব্যর্থ সংবিধান; ঔপনিবেশিক আইন কাঠামো; যথাযথ দর্শনচেতনা এবং ইতিবাচক লক্ষ্য-নির্দেশনার অনুপস্থিতি; অযোগ্য-অসৎ-দায়িত্বহীন-লোভী-সংকীর্ণ স্বার্থান্ধ-অদূরদর্শী রাজনীতিবিদ,দল, নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনাকারী শক্তি, আর অন্ধকারে, বিবরে, প্রতারণায়, লুটপাটে এবং অসভ্যতায় ডুবে থেকে কর্দমাক্ত ও পুঁতিগন্ধময় হালতে জীবন যাপনকারী জনমণ্ডলী–এসবই একযোগে টিকিয়ে রেখেছে এদেশে, এই জনপদে বিদ্যমান পরিবেশ-পরিস্থিতিকে। চতুর্দিকে অবক্ষয়, মূল্যবোধের বিনাশ,রুচির বিকার ও দুর্ভিক্ষ। সভ্যতার ধস্ এজন্যই নেমেছে এদেশে। চলতি আবহ বজায় রেখে উপরোক্ত পরিস্থিতি থেকে মুক্তি নেই। মানবতা এখানে নিষ্পেষিত হতেই থাকবে। সভ্যতা এখানে হত্যার শিকার হবেই।

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন দেখা হয়েছে। পাকিস্তানী অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শাসন দেখা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের ২৭ বছর কেটে যাচ্ছে। এই বাংলাদেশে ডিক্টেটরশীপ, অটোক্রেসী, টির‍্যানী, অথরিটারিয়ান গভর্নমেন্ট এসেছে, গেছে। প্রেসিডেন্সিয়াল, পার্লামেন্টারী শাসনে পেন্ডুলামের মতো দোল খাচ্ছে বাংলাদেশ। এখানে আমলাতান্ত্রিক শাসন, সিভিল-মিলিটারী ব্যুরোক্রেসীর শাসন, মিলিটারী শাসন, সিভিল শাসন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দাবিদার শাসন, জাতীয়তাবাদী শাসন, বহুদলীয় গণতন্ত্র, একদলীয় বাকশালী শাসন, জাতির পিতার শাসন, জাতির পিতার কন্যার শাসন--সবই আমরা দেখেছি ও দেখছি। ইতর-বিশেষ নেই। পার্থক্য পরিমাণে, গুণে নয়। সবাই এক গোয়ালের, সবাই এক ভাগাড়ের, সবাই এক রসূনের। সবাই আশ্বাসবাণী শুনিয়ে

www.pathagar.com

প্রতারণা করেছে। কেবল আখের গুছিয়েছে জনস্বার্থকে পদাঘাত করে। পাশের দেশের প্রভুর পদলেহনে সিদ্ধি অর্জন করেছে কমবেশী সবাই। তবে বংশানুক্রমিক গদীনশীনরা এক্ষেত্রে সবচেয়ে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। একেবারে বিবস্ত্র হয়েও তারা বীতরাগের তকমা এঁটেছে। দেশে একাত্তরে চলেছে মুক্তিযুদ্ধ, এখন চলছে চুক্তিযুদ্ধ। আমাদের লড়াকু সরকার এক্ষেত্রে চরম পরাভূত, আত্মসমর্পিত, নতশির হয়েও কল্পিত ও প্রতারক বিজয়ের বার্তা নিয়ত প্রচার করে নিজেরা আনন্দে আত্মহারা। কোনো খোঁজ নেই দেশ কোথায় যাচ্ছে, অর্থনীতির কি হালত, রাজনীতির এ কোন অমানিশা, আদর্শের কোথায় গোলযোগ ও দিকভ্রান্তি, দায়িত্বে কোথায় গাফিলতি, পরিকল্পনায় কোথায় ত্রুটি, কাজে কোথায় ব্যর্থতা, আন্তরিকতার কোথায় অভাব, জনকল্যাণ সাধনে কোথায় সমস্যা। ইতিহাসের ঠিকাদারি, অতীত নিয়ে মিথ্যাচার, পিতার স্বপ্ন, গোষ্ঠীর রক্তদানের কল্পকথা, মূর্খতা-অজ্ঞতা-অপরিণামদর্শিতার জিদ, চাটুকারদের বৃত্ত, মস্তানি-গুন্ডামি-লাম্পট্যের মদমত্ততা কোনো ভাল ফল দেয়নি অতীতেও, দেবে না আজো।

স্বাবলম্বী-স্বনির্ভর বাংলাদেশ আজ দূরের স্বপ্ন। ইমার্জিং টাইগার আজ মরীচিকা। প্রতীকী ব্যঞ্জনায় দেখুন, টাকা থেকে আজ রয়েল বেঙ্গল টাইগার পালাচ্ছে। আজ রাস্তার খেটে খাওয়া দিন মজুরও জানে-স্বামী আছে, সংসার নেই; চুক্তি আছে, পানি নেই; চুক্তি আছে; শান্তি নেই; স্বাধীনতা আছে, কর্তৃত্ব নেই; সব আছে, কিন্তু কিছুই নেই।

কোথায় সম্ভাবনা ঃ কিসে কল্যাণ

বাংলাদেশে রয়েছে কন্টিগিউয়াস টেরিটোরী। অখণ্ড ভূখণ্ড এই দেশের। সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে এ দেশের। রয়েছে ভাষা-সংস্কৃতির হোমোজিনিটি। রয়েছে রিসোর্স পোটেনশিয়াল। গ্যাস, তেল, পাথর, কয়লা, চুনাপাথর, অন্যান্য খনিজ-বনজ-মৎস্য সম্পদ সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের। ইউরেনিয়ামের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। আমাদের দেশের রয়েছে ভূ-কৌশলগত বিশাল গুরুত্ব। দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে তো বটেই, মায়ানমার হয়ে স্থলপথে এবং বঙ্গোপসাগর হয়ে সমুদ্র পথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং দূরপ্রাচ্যেও রয়েছে আমাদের অবারিত দ্বার। বঙ্গোপসাগরের জলরাশির সকল সম্ভাবনা নিয়ে এর ওপর রয়েছে আমাদের অধিকার। অন্যান্য শক্তিসহ চীন কেন আমাদেরকে গুরুত্ব দেবে, জাপান কেন গুরুত্ব দেবে, কেন ভারত আমাদেরকে গুরুত্ব দানে বাধ্য হবে, আজকের ইউনিপোলার ওয়ার্ল্ড পার্সপেক্টিভস-এ একক বিশ্বশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন আমাদের দেশকে আজ অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে, আন্তর্জাতিক পুঁজি-কেন্দ্র আজ কেন আমাদের ব্যাপারে উৎসাহী, অ্যামেরিকান কোম্পানীগুলো কেন আজ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আমাদের দেশে ব্যয় করতে পরান্মুখ, কেন আজ অ্যামেরিকান পররাষ্ট্র সচিব

www.pathagar.com

(মন্ত্রী) ম্যাডেলিন অলব্রাইট আমাদের দেশে ছুটে আসতে চান, কেন এ্যামেরিকান প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন আজ এদেশ সফরে এত আগ্রহী--এসব কিছু আজ আমাদেরকে, বাংলাদেশের সচেতন মানুষ যারা তাদেরকে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। তাহলেই বুঝতে পারা যাবে, এত সম্ভাবনা সত্ত্বেও বাংলাদেশ কেন আজো দুর্বিষহ অবস্থায় পড়ে আছে; শাসকগোষ্ঠীর, নেতৃত্বের, দলীয় রাজনীতির অযোগ্যতা, আদর্শের অন্তঃসারশূন্যতা ও আদর্শহীনতার পরিণাম কেন এত গভীর; কেন বিদ্যমান ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সরকার ও রাষ্ট্রকাঠামো কিছু দিতে অক্ষম; কল্যাণ আনয়নে অপারগ।

সচেতন, বিবেকবান, দেশপ্রেমিক, তৌহিদে বিশ্বাসী মানুষেরা আরো ভেবে দেখতে হবে, স্পষ্ট করতে হবে নিজের কাছে, অন্যদের কাছে ও সমাজ-সমষ্টির কাছে এই সত্য যে, বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় নব্বই ভাগ মুসলমান। তারা দ্বীন ইসলামের অনুসারী এবং সেমত জীবন-যাপনে ইচ্ছুক। এখানে কেবল নয় ভাগের সামান্য কিছু বেশি হিন্দু এবং শতকরা এক ভাগ খ্রীস্টান, বৌদ্ধ ও অন্যরা। কাজেই বাংলাদেশের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে ইসলাম। নিয়ন্ত্রক শক্তি হবে, নেতৃত্ব দানকারী শক্তি হবে মুসলমান। গণতন্ত্রের ও ন্যায়-নীতির ব্যাখ্যায় ও বিবেচনায় এটির গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। সুতরাং তৌহিদ, ইসলাম, আল কুরআন ও সুন্নাহ এবং মুসলমানী কালচার ও নেতৃত্বই বাংলাদেশকে বিবর থেকে, অন্ধকার ও পশ্চাদপদতা থেকে, অপমানের-শোষণের-পীড়নের জীবন থেকে আলোকোজ্জ্বল, কল্যাণময় জীবনের দিকে, শোষণহীন-সুখী-সমৃদ্ধ জীবনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আদর্শ, অবস্থান, ভূমিকা, নেতৃত্ব, প্রজ্ঞা, নিষ্ঠা, সততা, তাকওয়ার দিক থেকে খুলাফা-ই-রাশিদীন এর মতো মানুষ চাই আমরা। আর যেটা সবচেয়ে দরকার তা হচ্ছে, প্রকৃত অর্থে আল কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী, শরীয়া অনুযায়ী, ইসলামী সংবিধান ও আইনী কাঠামোর ভিত্তিতে সংবিধান, রাষ্ট্র, সংসদ, সরকার, প্রশাসন, প্রতিষ্ঠান, পরিবার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রচার মাধ্যম, মসজিদ, প্রেস ও জনজীবনের নীতি-নির্দেশনা, নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও কার্যক্রম।

কি প্রয়োজন ঃ কি করতে হবে

উপরে সম্ভাবনা ও কল্যাণ-এর সূত্র চুম্বকে তুলে ধরতে গিয়ে এক কথায় বলা হয়েছে আজকের বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়ের পিছনকার কারণগুলো আসলে কোন্ শর্তের বিদ্যমানতায় কাজ করছে এবং কোন্ শর্তের অনুপস্থিতিতে দেশে, জনজীবনে এই বিপর্যয়, অচলাবস্থা, অত্যাচার চলছে। জানানো হয়েছে নেতৃত্ব, আদর্শ, সংস্কৃতি, সংবিধান এবং রাষ্ট্র ও সরকার কাঠামোর কোন্ শর্ত, কোন্ ধরনের উপস্থিতি ও পরিবেশ,

www.pathagar.com

কেমন কাঠামো ও কীরূপ নিয়ন্ত্রণ আর পরিচালন সবকিছুর মোড় ঘুরিয়ে দিতে, মৌলিক বদল আনতে, খোল নইচে পাল্টে ফেলতে, সমৃদ্ধ-কল্যাণময় জীবনের দিকে এগোনোর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রতিষ্ঠান, কর্মী, মানবিক বৃহত্তম ঐক্য আর ইতিবাচক দৃষ্টি তৈরীতে একমাত্র সম্ভাবনাময়, সৎ ,তাৎপর্যপূর্ণ বিকল্প উপস্থাপন করতে পারে। ইসলামই সেই বিকল্প। আল কুরআন ও সুন্নাহ তথা শরীয়া বা ইসলামী বিধানুযায়ী সংবিধান রচনা, নেতৃত্ব সংগঠন এবং রাষ্ট্র পরিচালনাই একমাত্র সমাধান। এই বিশ শতকের শেষ দিনগুলো পর্যন্ত সবকিছু, সকল সিস্টেমই পরীক্ষা করা হয়েছে। আমাদের দেশে পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, মিশ্র অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক পুঁজির মুক্তবাজার অর্থনীতি--সবকিছু দেখা হয়েছে। ব্যর্থতাই হয়েছে এদের একমাত্র উপহার। আমলা শাসন, সেনা শাসন, আমলা-সেনা যৌথ শাসন, একনায়কত্ব, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, রাষ্ট্রপতি শাসন, সাংসদীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্যশীল শাসন--সব ধরনের সরকারই এখানে ব্যর্থ হয়েছে। নেতারা, রাজনীতিবিদরা, অনুসারীরা, ব্যবসায়ীরা, আমলা-সামরিক কর্তারা সফল হয়েছে ব্যক্তি জীবনে। দেশ-দশের বিনিময়ে আত্মসমৃদ্ধি অর্জন করেছে তারা। জাতি, জনগণ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। কতিপয়ের, গোষ্ঠীর, গোত্রের, পরিবারের সমৃদ্ধি ও রমরমা অবস্থা এলেও জনগণের কল্যাণ-মুক্তি-সমৃদ্ধি আসেনি। দারিদ্র্য, বঞ্চনা, বৈষম্য, বৈপরিত্য আরো বেড়েছে। দেশ-জাতি আজ ভিক্ষুক, দিশেহারা। ন্যায্যতা, স্বাভাবিকতা, সম্ভ্রম আজ ভুলুণ্ঠিত। এ যাবৎ চেপে-বসা এবং বিদ্যমান শাসন কাঠামো ও তাদের আদর্শ এসবই দিয়েছে বাংলাদেশকে। এগুলোকে তাই অস্বীকার করতে হবে, ভেঙ্গে ফেলতে হবে। এদের থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করতে হবে, এদের বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে। তৌহিদী জনতার গণবিপ্লবের মাধ্যমে, ইসলামী আন্দোলন-সংগ্রাম-বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামো, সাংবিধানিক ও আইনী ব্যবস্থা, বিদ্যমান সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি চলতি শাসন-শর্তকে উচ্ছেদ করতে হবে সমূলে।

দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে, নব্বই ভাগ তৌহিদী জনতার জীবন চর্চার সামগ্রিক দর্শনের দিকে, দ্বীন ইসলামের দিকে ফেরাতে হবে। আল কুরআন ও সুন্নাহই হবে আমাদের জীবন পরিচালনার সামগ্রিক, কেন্দ্রীয়, মৌলিক ও একমাত্র শর্ত। মনে রাখতে হবে, কেবল ইসলামকেই আজকের দুনিয়ায় কোথাও পরীক্ষা করে দেখা হয়নি রাষ্ট্র শাসনের শর্ত হিসেবে। কোথাও কোথাও কিছু কিছু শুরু হয়েছে। সামগ্রিক, গভীর, দূরদর্শী চেতনা এখনও আসেনি। আমাদের বাংলাদেশেও ইসলাম রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে, সাংবিধানিক ও আইনী কাঠামো হিসেবে এবং সরকার ও শাসন পরিচালনাকারী নেতৃত্ব ও শক্তি হিসেবে আজো পরীক্ষিত হয়নি। পুঁজিবাদের ব্যর্থতা, সমাজবাদের ব্যর্থতা, সাম্রাজ্যবাদের চরম

www.pathagar.com

ধ্বংস, মুক্তবাজার অর্থনীতির মুখ থুবড়ে পড়া ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে আজ বিশ্ব পরিমণ্ডলে দেশে দেশে ইসলাম এক নতুন শক্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। ইসলামের অত্যন্ত ইতিবাচক রিসার্জেন্স ঘটছে। এর সম্ভাবনা আজ দিগন্তপ্রসারী। দেশে দেশে এর জন্য আবেদন অত্যন্ত উঁচুমাত্রায় উঠছে। সারা দুনিয়ায় মুসলমানদের ডিমোগ্রাফিক অবস্থান, বিশ্বের এতগুলো মুসলিম অধ্যুষিত দেশের উপস্থিতি, ওআইসিসহ সারা দুনিয়ায় মুসলিম উম্মাহর ঐক্য চেতনা, খ্রিষ্ট ও ইহুদীবাদের বর্বরতা, বাতিলপন্থা ও ব্যর্থতা, সমগ্র দুনিয়ার কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থলভাগ ও জলরাশি, প্রণালী, ক্যানেল মুসলিম দেশগুলোর অনেক কটির দখলে থাকা, মুসলিম দেশগুলোতে প্রাপ্ত ও সম্ভাবনার সীমায় থাকা রিসোর্স পোটেনশিয়াল ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মুসলমানরা যতটুকু বুঝেছি, তার চেয়ে অনেক বেশি করে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদ, খ্রিষ্ট ও ইহুদী চক্র ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে আধিপত্যবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদ বুঝতে পেরেছে আগামী দিনগুলোতে ইসলাম কীভাবে মহাদেশে মহাদেশে, সাগর-মহাসাগর পেরিয়ে দেশে দেশে রাষ্ট্রীয় ও বিশ্বশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে।

সেজন্য খ্রীষ্টান চক্রের অভ্যন্তরীণ 'মৌলবাদ'-এর সমস্যাকে তারা ইসলামের উপর নির্জলা মিথ্যা দোষারোপ করে চাপিয়ে দিতে এত ব্যগ্র। সেজন্য তারা ইসলামকে সন্ত্রাসী শক্তি হিসেবে দেখতে চাচ্ছে। তাই তাঁরা লেগেছে তৌহিদী জনতার পিছনে দেশে দেশে। ইসলামী আন্দোলনকে প্রতিটি সমাজে তারা অঙ্কুরে মেরে দিতে চাচ্ছে। এ কাজ একযোগে চালাচ্ছে আন্তর্জাতিক পুঁজি শক্তি, বিশ্বব্যাংক ও এর এজেন্সী, আন্তর্জাতিক খ্রীস্ট-ইহুদী-ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রপাগাণ্ডা ওয়ারফেয়ার এবং দেশে দেশে শিখন্ডী ও সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলকামী মতলববাজ শাসকচক্র, রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও টাকা-খাওয়া মাথা বিকিয়ে-দেওয়া বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে। দরকার হলে তারা যুদ্ধ চাপিয়ে দেবে, আগ্রাসন চালাবে, পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে। যেমন দিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে, যেমন দিয়েছে ইরানে, ইরাকে, কুয়েতে ও অন্যান্য মুসলমান রাষ্ট্রে। দরকার হলে তারা গণতন্ত্রের সোল এজেন্সী রেখেও বাইরে থেকে গায়ের জোরে দেশের সেনাশক্তিকে চাপিয়ে দেবে সামরিক শাসনের মাধ্যমে। যেমন দিয়েছে আলজেরিয়ায়। যেমন তারা আগ্রাসন, পরিচালনা করিয়েছে, ইসলামকে সরিয়ে দিয়ে তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষতার ক্যাপসুল গিলিয়েছে। তারা আফগানিস্তানে পিছনে লেগেছে, সেন্ট্রাল এশিয়ার পিছনে লেগেছে, পাকিস্তানের পিছনে লেগেছে, বাংলাদেশেও লেগেছে। বাংলাদেশেও ইসলাম বিরোধী শক্তি বাইরে ও ভিতরে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে নাশকতামূলক কাজ চালাচ্ছে রাষ্ট্রে, সরকারে, প্রশাসনে, শিক্ষায়, মিডিয়ায়, প্রেসে, সংস্কৃতিতে। পাশ্চাত্য-নির্ভর এনজিও এবং ভাড়াটে একদল বুদ্ধিজীবী

www.pathagar.com

ইসলামের বিরুদ্ধে জোরেশোরে লেগেছে। বাংলাদেশে তৌহিদী জনতার সচেতন অগ্রসর অংশকে আজকের বিশ্ব প্রেক্ষাপট ও বিশ্ব রাজনীতির দিকে অত্যন্ত নজর রাখতে হবে। তথ্য সংগ্রহ, অনুসন্ধান, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল ও কর্মধারা নির্ধারণ--এসব চালিয়ে যেতে হবে। উপমহাদেশের আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট, দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের অবস্থা উপলব্ধিতে আনতে হবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও দেশীয় প্রেক্ষাপট--তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে বিশ্লেষণ সীমায় আনতে হবে গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে। ইসলামকে দ্বীন হিসেবে, আল কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌম ইচ্ছা, নীতি-নির্দেশ ও প্রক্রিয়া-পদ্ধতিকে যথার্থ অর্থে বুঝতে হবে।

প্রস্তুতি পর্ব ঃ চুম্বক ক্ষেত্র

বাংলাদেশে তৌহিদী জনতার নেতৃত্বদানকারী শক্তিকে ঈমান, ইলম্ ও হিকমতের গভীরতর উপলব্ধি অর্জন করতে হবে। ইসলামী জীবনাদর্শের পূর্ণাঙ্গতা, গভীরতা, সত্যতা, কল্যাণময়তা ও সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা, এর পরিকল্পনা ও কর্মপ্রবাহ সম্পর্কে স্পষ্ট চিত্র নিজেদের উপলব্ধিতে এবং জনতার অন্তরে ব্যাঙময় করে তুলতে হবে। ইসলামী নেতৃত্বের প্রস্তুতি, জনসমাজে কমিউনিকেশন, জনতার মবিলাইজেশন এবং তাদেরকে যথাযোগ্যভাবে ইসলামী আন্দোলন-সংগ্রাম-বিপ্লবের প্রবাহে নিয়ে আসার জন্য ধার করা, পরিত্যাজ্য, কুফরী কালচার ও আদর্শকে ছুঁড়ে ফেলতে হবে আবর্জনা হিসেবে। অতঃপর অনুসন্ধান চালাতে হবে, ফিরে যেতে হবে, ফিরিয়ে নিতে হবে, তৌহিদী দ্বীনের রুট বা শিকড়ে। হিযবুল্লাহর প্রাথমিক প্রস্তুতি, প্রথম পদক্ষেপ এখান থেকেই শুরু করতে হবে। গতানুগতিক পদ্ধতি, আনুষ্ঠানিকতা, অগভীরতা, চলতি বোল-চাল এবং বিদ্যমান সংস্কৃতি দিয়ে কিংবা এর সঙ্গে ভাগাভাগি ও আপোস করে 'ইসলাম' হবে না। এখানে কোন কম্প্রোমাইজ নেই। হয় চলতি বাতিলপন্থা, না হয় একমাত্র সত্য ও অফুরন্ত সম্ভাবনাময় হক পন্থা। তৌহিদী জনতা হকপন্থাকে ঈমানে-আমলে নিয়ে, নিজে প্র্যাকটিস করে ও অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়ে জিহাদের প্রেরণায় উজ্জীবিত সমষ্টি গড়ে তুলবে।

বর্তমান বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় রোধে ইসলামী শরীয়ার কোন বিকল্প নেই। আজ দেশের সামনে, মানবসমষ্টির সামনে যে চ্যালেঞ্জ, তা মোকাবিলা করতে হবে দ্বীন ইসলামের আদর্শ ও নীতি দ্বারা, এর কর্মসূচী-কর্ম প্রবাহ দ্বারা। সংবিধান, আইনী কাঠামো, রাষ্ট্র-সরকার-প্রশাসন, সংস্কৃতি, শিক্ষা, মিডিয়া, প্রেস, পরিবার, অর্থনীতি, মানবিক সম্পর্কের ও কর্মের যাবতীয় মাত্রা-এসবকে সাজাতে হবে, গড়ে তুলতে হবে ইসলামী শরীয়া আইনের ও বিধানের ভিত্তিতে, এর দাবি অনুযায়ী।

www.pathagar.com

ইসলামী শরীয়া ঃ উৎস সন্ধান

এখন এই যে ইসলামী শরীয়া বা ইসলামী বিধানের ভিত্তিতে রাষ্ট্র চালানো, জীবন সাজানোর কথা বলা হচ্ছে--এই শরীয়ার সংক্ষিপ্ত একটি পরিচয় প্রসঙ্গত অত্যন্ত জরুরী। আভিধানিক দিক থেকে শরীয়া মানে হচ্ছে, এমন পানি, যে জায়গায় পিপাসু মানুষেরা জড়ো হয়ে, একযোগে একত্রে তা পান করে তৃষ্ণা মেটায়। ব্যবহারিক দিক থেকে শরীয়া তাই এক অত্যন্ত দৃঢ়, মজবুত, সরল পথকে বোঝায় যে পথ ধরে চলা মানুষেরা হিদায়াত ও সঙ্গতিপূর্ণ কর্ম নির্দেশনা অর্জন করতে পারে। পানির উৎস প্রাপ্তি এবং একত্রিত হয়ে তৃষ্ণা নিবারণের রূপকে জীবন যাপনের দিক-নির্দেশনা ও ঐক্যবদ্ধ পথ চলা শরীয়তের অন্তঃসার।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বীয় বান্দাদের সকল ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য যে সকল আদেশ, নিষেধ ও পথনির্দেশ দিয়েছেন আল কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে এবং এদের সম্প্রসারিত ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে যা উপলব্ধ হয়, ফিকাহ্‌বিদদের ভাষায়, তা-ই শরীয়ত। আল্লাহ্‌র উপর ঈমানের ভিত্তিতে তৌহিদী জীবন দর্শন গ্রহণ ও এর পরিপূর্ণ আমলই মানুষের জন্য সত্যিকার আদর্শ। আকীদা-বিশ্বাসমূলক নিয়ম-নীতি, নৈতিকতা ও চরিত্র সংক্রান্ত নিয়ম-নীতি, সমগ্র জীবন পরিচালনার বাস্তব কাজকর্ম সংক্রান্ত আইন-বিধান--এই তিনটি বড় বড় দিক নিয়ে ইসলামী শরীয়ত। ইসলামী আইনের বিধানাবলী এখান থেকেই উৎসারিত। দুনিয়ার মানুষকে মিথ্যা, ভ্রান্তি, অনাচার, কামনা, লালসা, ভেদ, হানাহানি, না-হক হতে পবিত্র করে সত্য, সুন্দর, সুবিচার, ন্যায়, কল্যাণ ও হক-এর দিকে চালিত করার জন্য; এই দুনিয়ায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের গুরুদায়িত্বের কর্মটি সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে সমাধা, বাস্তবায়ন ও জারি রাখার জন্য বিশ্বাসমূলক, দৃঢ়, সুষ্ঠু ও বক্রতামুক্ত সরল পথ, যেটি কেবল আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের বিনিময়ে সমগ্র সামাওয়াত ও আরদ্-এর সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের, এসব কিছুকে স্বীয় জ্ঞান ও কল্যাণে লাগানোর সুযোগ করে দেয় মানুষকে, সেটিই হচ্ছে স্বাধীন ইনসানিয়াতের একমাত্র জীবন পথ। একেই বলে ইসলামী শরীয়া। এই শরীয়া গভীরভাবে বুঝতে গিয়েই ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রের (Islamic Jurisprudence)-এর উৎপত্তি ঘটেছে। দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক, গভীর ও সুক্ষ্ম জ্ঞানই ইলমুল ফিকাহ শরীয়তের মৌলিক দলিলসমূহের ভিতিতে বাস্তব কাজ-কর্ম বিষয়ক বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞানই ফিকাহ্। এটি ইসলামী ব্যবহার তত্ত্ব বা আইন বিধান। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ব্যাপারে গভীর জ্ঞান, চিন্তা, গবেষণার মাধ্যমে ইজতিহাদের সহায়তায় বহু ধারণা তৈরী হয়েছে যাতে করে শরীয়তের হুকুম-আহকাম জানা-বোঝা

www.pathagar.com

সম্ভব হয়েছে। এগুলো ফিকাহ্‌র আওতায় আসে। ইল্‌মে ফিকাহ্‌ তাই শরীয়তের যাবতীয় বিষয় এবং এতদসংক্রান্ত দলিল প্রমাণকে বাস্তবভুক্ত করে দু'ভাগে বিভক্ত। শরীয়তের হুকুম-আহকামের জ্ঞানে পারদর্শীকে ফকীহ বা ফিকাহ্‌বিদ বলা হয়। ইসলামী ফিকাহ্‌-এর বিধি-বিধানের সামগ্রিকতার মধ্যে আল্লাহ্‌র ইবাদত, ব্যক্তি, সমাজ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র, সংবিধান, সরকার সবকিছু এসে যায়। হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ-এর সকল দিক এর আওতাভুক্ত। ইসলামী ফিকাহ্‌-তে এ জন্য ইবাদত (Faith, Worship, Prayer) এবং মুয়ামিলাত (Mutual Transactions)-সবকিছু এসে যায়। ইবাদতের অংশে কালেমা, সালাত, সাওম, যাকাত, হাজ্বসহ আল্লাহর যিকর এবং এমন কি পারিবারিক আইনকেও (Family Code) অন্তর্ভুক্ত করেছেন ফিকাহ্‌বিদগণ। আর মুয়ামিলাতের ভিতর এসেছে মানবিক জীবনের, রাষ্ট্রিক-সামাজিক জীবনের অন্য সকল দিক যেখানে সংঘবদ্ধ জীবাণু, সাধারণ কল্যাণ ও সামাজিক জীবনের বিষয়াদি রয়েছে। সাংবিধানিক (Constitutional) এবং প্রাতিষ্ঠানিক (Institutional) বিষয়াদিও ফিকাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত। শরীয়তভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা নীতি, শিল্পনীতি, রাজস্ব নীতি, বিদেশ নীতি, উৎপাদন নীতি, সম্পদ নীতি, বন্টননীতি, শিক্ষানীতি--সবকিছু ফিকাহ্‌র আওতায় থাকছে। ফিকাহ্‌ শাস্ত্রের বিকাশের প্রক্রিয়ায় ফিক্‌হী মাযহাবও এসেছে। ফিকাহ্‌ ইসলামী জ্ঞানের এক বিশাল ভাণ্ডার–তত্ত্বে, দলিলে, বাস্তব কাজে-কর্মের বিধি-বিধানের সমাহারে।

এখানে ইসলামী আইনের মৌল উৎস হচ্ছে আল কুরআন ও সুন্নাহ বা হাদীস। ইসলামী আইন ও শরীয়া এ দুটো থেকে পাওয়া যায়। এছাড়া ইজমা (Consensus), কিয়াস (Analogy or Analogical Deduction), ইজতিহাদ (Exposition of Law) থেকেও শরীয়া আইন, হুকুম-আহকাম, বিধি-বিধান বের করা যায় এবং বের করা হয়েছে। কিন্তু এগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অন্য নিরপেক্ষ মর্যাদার অধিকারী নয়। অপরিহার্য ও অনিবার্যভাবেই তা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত ও প্রমাণিত। সুতরাং ইজতিহাদসহ অন্যান্য দিক ইসলামী আইনের আনুষঙ্গিক উৎস।

অবক্ষয় প্রতিরোধ ও রাষ্ট্র শাসনে
শরীয়া বা ইসলামী আইনের প্রাসঙ্গিকতা

বস্তুত, দ্বীনের হিফাযত, জীবন রক্ষা, সহায়-সম্পদ রক্ষা, মানুষের বংশ রক্ষা এবং মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও সুস্থতা রক্ষার জন্য শরীয়ত বা ইসলামী আইন অনিবার্য। সেই সঙ্গে সৌন্দর্য, মানবিক প্রয়োজন, কল্যাণ আনয়ন, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবতার মুক্তি ও সমৃদ্ধির নিমিত্তে শরীয়তের জ্ঞান অর্জন, এর বিধি-বিধান প্রচলন, এর কার্য-নির্দেশনা

www.pathagar.com

বাস্তবায়ন এবং এর আওতায় জীবন-পরিচালনা একান্ত প্রাসঙ্গিক, জরুরী ও একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ।

তৌহিদে বিশ্বাসীরা, মুসলমান জনসমাজে যে কেবল, প্রকৃত অর্থে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈধতাকেই (Legitimacy) স্বীকার করে নেবে, কেবল যে তা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাই চালাবে, শুধু যে ইসলামী রাষ্ট্রই (নামে ইসলামী, সিকিউলার, বা কুফরী-দর্শনে বিশ্বাসী রাষ্ট্র নয়) মুসলমানদের আনুগত্য দাবি করতে পারবে এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে কেবল যে ইসলামী রাষ্ট্রই মুসলমানদের জন্য একমাত্র কাম্য ও ন্যায্য ব্যবস্থা, তা আল কুরআনে পরিষ্কার জানানো হয়েছে। আল্লাহ্ বলেনঃ

"হে মুমিনগণ, আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে তাদেরকে মানো। কোনো বিষয়ে মতভেদ করলে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে সোপর্দ কর, যদি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী হও; এটিই উত্তম ও পরিণামে চমৎকার (আল কুরআন, সূরা আন্ নিসা-৪ ঃ ৫৯)।

আল কুরআনের আয়াতে কারীমার এই অংশের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম ও এর প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি অতি গুরুত্ববহ মৌলনীতি স্পষ্ট হয়। প্রথমত, মুসলমানদের উপর বা জনসমাজের উপর শাসন পরিচালনকারী রাষ্ট্রের এক নাম্বার করণীয় হচ্ছে-এর আওতাধীন ভূখণ্ডে শরীয়তের বিধান তথা ইসলামী আইন কার্যকর করা। যে রাষ্ট্র মুসলমানদের আনুগত্যের দাবীদার এবং তাদের কাছে বৈধতা লাভে ইচ্ছুক, তার জন্যে শরীয়তী আইন যে একেবারেই বাধ্যতামূলক, তাও আল কুরআনে পাওয়া যাচ্ছে। আয়াতে কারীমায় বলা হচ্ছেঃ

(১) "...আল্লাহ্র অবতীর্ণ বিধান দ্বারা যারা ফয়সালা করে না, তারা কাফির" (আল কুরআন, সূরা আল মায়িদাহ-৫ ঃ ৪৪ আয়াতাংশ)।

(২) " ...আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না, তারাই যালিম" (আল কুরআন, সূরা আল মায়িদাহ-৫ ঃ ৪৫ আয়াতাংশ)

(৩) "... আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না, তারাই ফাসিক"(আল কুরআন, সূরা আল মায়িদাহ-৫ ঃ ৪৭ আয়াতাংশ)

সুতরাং এ থেকে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ্র নির্দেশ হচ্ছে, মুসলমানদের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রই একমাত্র গ্রহণযোগ্যতা, বৈধতা ও সত্যিকার আনুগত্য দাবি করতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম মুম্বমিন মুসলমানের দায়িত্ব। আর ইসলামী রাষ্ট্রে, মুসলমানদের রাষ্ট্রে আল্লাহ্র হুকুম ও আইন কায়েম করতে হবে। সে কারণে যাবতীয় অবক্ষয়-অনাচার রোধে এবং ঈমান, ন্যায্যতা, সততা, সুন্দর, কল্যাণ ও সমৃদ্ধির স্বার্থে, দ্বীনী জিন্দেগী

www.pathagar.com

কায়েমের নিমিত্তে শরীয়ার বিধানাবলী তথা ইসলামী আইনই কায়েম করতে হবে রাষ্ট্রীয় জীবনে।

সমষ্টি জীবনে দ্বীন ইসলামকে আংশিক নয়, বরং পূর্ণভাবে গ্রহণ করার আদেশ তথা ইসলামী জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের নির্দেশনা আল কুরআনের বহু স্থলে পাওয়া যায়। যেমন--সূরা বাকারা-২ ঃ ১১২, ১৩০-১৩৪, ১৩৬, ২০৮-২১০; সূরা আল ইমরান-৩ ঃ ৫০-৫৩, ৮৩-৮৫; সূরা আন্ নিসা-৪ ঃ ১২৫; সূরা আল মায়িদাহ-৫ ঃ ৩; সূরা আল আনয়াম-৬ ঃ ১৪–১৬ , ১৫৪, ১৬১-১৬৪; সূরা হাজ্জ্ব-২২ ঃ ৭৭-৭৮; সূরা আর রুম-৩০ ঃ ৩০; সূরা লুকমান-৩১ ঃ ২২; সূরা আল আহযাব-৩৩ ঃ ৩৫-৩৬; সূরা যুমার-৩৯ ঃ ১১-১৪, ৫৪; সূরা শুরা-৪২ ঃ ৪৭; সূরা হুজুরাত-৪৯ ঃ ১৭; সূরা জ্বীন-৭২ ঃ ১৩-১৭ আয়াত।

ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আল-কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। যেমন–সূরা-আরাফ-৭ ঃ ১৬১-১৬২; সূরা আনফাল-৮ ঃ ২৬-২৮, ২৯-৩৭; সূরা হাজ্জ্ব-২২ ঃ ৪১ আয়াত।

সুতরাং মুসলমানরা কেবল ইসলামী রাষ্ট্রই কায়েম করবে না; তারা শরীয়তের বিধি-বিধান, নীতি-নির্দেশ ও প্রেফারেন্স অনুযায়ী সংবিধান তৈরী করবে, আইনী কাঠামো রূপ দেবে, বিচারালয় চালাবে, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও পরিবারসহ যাবতীয় কিছু নিয়ন্ত্রণ করবে। ব্যক্তির, সমষ্টির প্রতিষ্ঠানের জীবন ও কর্মধারা নির্ধারিত হবে শরীয়া তথা ইসলামী আইন দ্বারা। আল কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মৌল আইন ও নির্দেশ মেনেই মুসলমানদের রাষ্ট্র ও জীবন চলবে, সংবিধান কার্যকর হবে। ইজমা, কিয়াস, ইজতিহাদ দ্বারা আনুষঙ্গিক আইন তৈরী করা যাবে। কিন্তু তা কোনোভাবেই শরীয়ার মূল সোর্সকে বাই-পাস করে কন্ট্রাডিক্ট করে, ওভার-রুল করে যেতে পারবে না। লক্ষ্য করা যায় আল কুরআনে আল্লাহ বলেছেন ঃ

"আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিলে মুমিন নর কিংবা নারীর ইখতিয়ার থাকে না সে ব্যাপারে তার নিজের খেয়াল-খুশী মাফিক অন্য কোনো পন্থা অনুসরণ করা। যে আল্লাহ্‌কে ও রাসূলকে অমান্য করে সে প্রকাশ্য ভ্রষ্টতায় আছে" (আল কুরআন, সূরা আল্ আহযাব-৩৩ ঃ ৩৬)।

তাই মুসলমানদের কাছে সংবিধান, রাষ্ট্র, শাসন, প্রশাসনসহ জাগতিক যাবতীয় দিকের ভিত্তি শরীয়া বা ইসলামী আইনের ভিত্তিতেই কেবল গ্রহণযোগ্য ও বৈধ।

আবার একটু আগে সূরা আন্ নিসার-৪ ঃ ৫৯ আয়াতের উল্লেখ যেখানে করা হয়েছে তা থেকে দেখা যায়, আল্লাহ্ ও রাসূল (সাঃ)-এর আনুগত্য করার পর 'তোমাদের মধ্যে

www.pathagar.com

যারা কর্তৃত্বে আছে' তাদেরকে মানার কথা বলা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, মুসলমানরা তাদের মুসলিম জামায়াত-বহির্ভূত আর কোনো শাসকগোষ্ঠীকে যাদের শাসন চেপে বসবে বা বসেছে, তাদেরকে মানতে ধর্মগতভাবে ও নীতিগতভাবে বাধ্য নয়। মুলমানদের করণীয় হচ্ছে যথার্থভাবে শরীয়া আইনের ভিত্তিতে, আল কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে, যে মুসলিম শাসন কর্তৃপক্ষ চলবে, তাকে মানা। শরীয়া বিরোধী, ইসলাম বিরোধী, আল কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সাঘর্ষিক রাষ্ট্র ও শাসন কর্তৃপক্ষের আনুগত্য করার কোনো দায়িত্ব নেই মুসলমান জনগণের। এর পরিবর্তনই বরং তাদের করণীয়।

ইবনে উমরের সনদ অনুযায়ী সহীহ বুখারী ও মুসলিম থেকে দেখা যাচ্ছে ঃ

"নির্দেশটি সে পছন্দ করুক বা না করুক, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে কোনো পাপ কাজ করতে আদেশ দেয়া না হচ্ছে, ততক্ষণ শ্রবণ করা ও পালন মুসলমানদের উপর বাধ্যতামূলক। কিন্তু যদি তাকে পাপ কর্মের নির্দেশ দান করা হয়, তা শ্রবণ করা বা পালন করার কথাই উঠে না"।

তাই 'তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে তাদের প্রতি মুসলমান জনতার আনুগত্য শর্তসাপেক্ষ এবং তা হচ্ছে তারা আল্লাহ্ ও রাসূল (সাঃ)-এর অনুগত থাকলো কি-না, তারা ইসলামী শরীয়া মেনে চললো কি-না এবং সেমত রাষ্ট্র-সরকার-প্রশাসন চালালো কি-না। এ না হলে মুসলমান জনতা তাদের সমর্থন প্রত্যাহার ও বিদ্রোহ করে নতুন সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার কায়েম করতে পারে। দেখা যাচ্ছে, শরীয়ার মূলনীতির ভিত্তিতে জনসম্মতিই ইসলামী রাষ্ট্রের ও সরকারের বৈধতা ও স্থায়িত্ব-নির্ধারক।

কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে এভাবে জনসম্মতি এবং জাতির ঐকমত্যভিত্তিক ইচ্ছে তথা ইজমা মূল্যবান হলেও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সামাওয়াত-আরদ্সহ রাষ্ট্রেরও আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং। আসলে কোনো মুসলমান সমাজে, ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো শাসন ব্যবস্থা, পদ্ধতি, রাষ্ট্রীয় পরিচালনা সমষ্টিগত কল্যাণ ভাবনা ও পরিকল্পনা ইত্যাদি বলতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে চূড়ান্ত একক নিয়ন্ত্রক মালিক মেনে নিয়ে, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে, আল কুরআন ও সুন্নাহর বিধান মেনে শরীয়া আইনের ভিতরে থেকে দৈনন্দিন ক্ষেত্রে জনগণের সম্মিলিত ভাবনা-চিন্তার, মতামতের সিদ্ধান্তের গুরুত্ব ও বাস্তবায়নকেই বুঝায়। আল কুরআনে আল্লাহ্র ঘোষণা হচ্ছেঃ

"বল, হে সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ্। আপনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা কেড়ে নেন; ইচ্ছামত সম্মান দেন আর ইচ্ছামত লাঞ্ছনা দেন। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে; আপনিই সর্বশক্তিমান" (আল কুরআন, সূরা আলি ইমরান-৩ঃ২৬)। আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের কথা উল্লেখিত হয়েছে।সূরা নমল-১৬ ঃ ৭১, সূরা বনি

www.pathagar.com

ইসরাঈল-১৭ ঃ ১১১,সূরা মুমিন-২৩ ঃ ৯১, ১১৬-১১৭; সূরা ফুরকান-২৫ ঃ ২; সূরা কাসাস-২৮ ঃ ৭০, ৮৮; সূরা ফাতির-৩৫ ঃ ৩; সূরা সাফফাত-৩৭ ঃ ৪; সূরা হাশর-৫৯ ঃ ২৩ আয়াতে।

কাজেই সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ্ এবং শরীয়ার মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহ্‌রই ইচ্ছা। মুসলমানরা, তাদের শাসকরা, তাদের রাষ্ট্র পরোক্ষভাবে কেবল আমানত ভোগ করে শরীয়া আইনের ভিত্তিতে পরিচালিত ইসলামী রাষ্ট্রে। এখানে জনসম্মতি, সমষ্টির ইচ্ছা, নাগরিকের আনুগত্য, জনগণের দায়িত্ব ও অধিকার সরকারের ভূমিকা--সবকিছু নির্ধারিত হবে শরীয়া তথা ইসলামী আইন দ্বারা।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় প্রতিরোধের মূল প্রশ্নে; রাষ্ট্রীয় অনাচার, সরকারী অবৈধতা, প্রশাসনের দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচার, সংবিধানের সমস্যা, দল-রাজনীতি-নেতৃত্বের ভূমিকা, জ্বিনা, ঘুষ, চুরি, মদ্যপান ও মাদকতা, সুদ, ছিনতাই, ঋণ খেলাপ, নির্লজ্জতা ও নগ্নতা, অন্যায়-অবিচার, শোষণ-লুটপাট, মিথ্যাচার-মুনাফিকী ইত্যাদি সব কিছু দূর করার জন্য (শরীয়া আইনে এসবের প্রতিরোধ, প্রতিবিধান, নিবারণ, সংশোধন, অপনোদনের বিষয়ে খুঁটি-নাটি আইন আছে) এবং সার্বভৌম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন ও দ্বীন ইসলাম কায়েমের জন্য শরীয়া আইন তথা ইসলামী আইনের প্রতিষ্ঠা, কার্যকারিতা, সেমত জীবন নির্মাণই মুসলমান জন অধ্যুষিত এই বাংলাদেশে একমাত্র গ্রহণযোগ্য সমাধান। এর কোন বিকল্প নেই। আল্লাহ হাফিজ।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন

ড. তারেক শামসুর রেহমান*

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দ্বিমেরু ভিত্তিক বিশ্ব ব্যবস্থার উদ্ভব ও স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা পর্বে উন্নয়নশীল বিশ্বের কিছু দেশ বিশ্ব আসরে তাদের অবস্থানকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনা করেছিল, যা আজ 'ন্যাম' (এনএএম) নামে পরিচিত। ১৯৬১ সালে যেখানে ২৫টি দেশ আর ৭৫০ মিলিয়ন লোকের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়েছিল, আজ সেখানে এ আন্দোলন প্রতিনিধিত্ব করছে ১১৩টি দেশের আর ১৯৫০ মিলিয়ন জনগোষ্ঠীর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরই বিশ্ব আসরে বেশ কিছু নতুন রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। সে সব দেশের নেতৃত্বের সারিতে আসীন ব্যক্তিবর্গ দ্রুপদী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী না হলেও, তারা ছিলেন প্রচণ্ডভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী। স্বাধীনতার পর তারা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সংহত করা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে নিজেদের একত্রিত থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। আর এ লক্ষ্যেই ১৯৬১ সালে যুগোশ্লাভিয়ায় প্রথম জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের জন্ম হয়। যদিও এর ভিত্তি রচিত হয়েছিল ১৯৫৫ সালের এপ্রিলে ২৯টি আফ্রো-এশীয় দেশের বান্দুং শীর্ষ সম্মেলনে। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে চীন ও ভারত কর্তৃক গৃহীত পঞ্চশীলার নীতিকে ভিত্তি করেই আন্দোলনের সূচনা করেছিল। আর পঞ্চশীলাকে কেন্দ্র করেই বেলগ্রেড সম্মেলনে জন্ম হয় 'ন্যাম' এর। যদিও সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী ভূমিকা ছিল মুখ্য। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের একটি দলিলে বলা হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ, বর্ণ বিদ্বেষ, জাতিগত বৈষম্য, সকল ধরনের বিদেশী আগ্রাসন, অন্যের ভূমি দখল, অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ঘটনায় হস্তক্ষেপ এবং বৃহৎশক্তি ও জোটের বিরোধী ধারনা নিয়েই জোটনিরপেক্ষ নীতির মূল বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। বার্টন বলেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী জাতীয়তাবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরোধিতা ও অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের পটভূমিকায় জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে উঠেছে ও এসব উপাদান বিকাশে সাহায্য করেছে।

---

* জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের শিক্ষক, বিশিষ্ট কলামিস্ট।

www.pathagar.com

তবে জোটনিরপেক্ষতার কথা বলে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন আদৌ জোট নিরপেক্ষ থেকেছে কিনা, কিংবা 'ন্যাম' নিজেই একটি জোটের জন্ম দিয়েছে কিনা এ ব্যাপারে এখনও বিতর্ক রয়ে গেছে। এম, এস রাজন প্রশ্ন তুলেছেন 'ন্যাম'-এর সদস্যদের অনেকেই বৃহৎ শক্তির সাথে বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ। এক্ষেত্রে এদের জোটনিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়। অপরদিকে যুগোস্লাভ লেখক এডোয়ার্ড কারদেলজও বলেছেন, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তির অভাবই এ আন্দোলনকে একটি জোটে পরিণত হতে দেয়নি। এমনকি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা জওহরলাল নেহেরুও চাননি জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন আলাদা একটি 'জোট' হিসেবে আবির্ভূত হোক। রিচার্ড জ্যাকসন নেহেরুর ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, নেহেরু উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য একটা আলাদা অস্তিত্ব ও ভূমিকা চেয়েছিলেন। কিন্তু অপর দুই জোটের তুলনায় উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য কোন স্থায়ী ভূমিকা চাননি। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে (১৯৬১) যুগোস্লাভিয়ার প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জোশেফ ব্রোজ টিটো জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে একটি আলাদা শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি এটাকে 'জোট' বলতে চাননি। জয়ন্তানুজা বন্দোপাধ্যায় জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে চিহ্নিত করেছেন বিপরীত শক্তি বা কাউন্টার ফোর্স হিসেবে। তবে কাঠামোগতভাবে বিগত বছরগুলোতে 'ন্যাম' একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত না হলেও 'ন্যাম' এর একটি ভূমিকা ইতোমধ্যে উন্মোচিত হয়েছে। বার্টন বলেছেন, প্রচলিত অর্থে জোটনিরপেক্ষতা বলতে বোঝায় সোভিয়েত গোষ্ঠী ও ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর নানারকম প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে বিদেশ নীতি গ্রহণ ও তা কার্যকরণের ব্যাপারে ভূমিকা পালন করা। এটা সত্য যে, 'ন্যাম' সম্মেলনে বারে বারে মার্কিন বিরোধী সমালোচনা প্রাধান্য পেয়েছে, কিন্তু এটাও সত্য যে, সত্তুর দশকে 'ন্যাম'কে সোভিয়েত নির্ভর করে গড়ে তোলা ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'ন্যাম'-এর স্বাভাবিক মিত্র হিসেবে চিহ্নিত করার একটা উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, যা কিনা বড় ধরনের বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু স্বাভাবিক মিত্রের ধারনা কখনো গ্রহণযোগ্য হয়নি। ১৯৮৯ সালে ও ১৯৯২ সালে দশম 'ন্যাম' শীর্ষ সম্মেলনেও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে বৃহৎ শক্তির প্রভাব বলয়ের বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে 'ন্যাম' যেমনি বৃহৎ শক্তির সমালোচনা করেছে, তেমনি নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, উন্নয়নশীল বিশ্বের ঋণ মওকুফ, দক্ষিণের গরীব দেশগুলোতে সম্পদের স্থানান্তর ইত্যাদির ব্যাপারেও বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আসছে। চলতি বছর ডারবানে সর্বশেষ যে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতেও এই বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে।

www.pathagar.com

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ তার জন্মের দু'বছরের মধ্যে অংশ নেয়। বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে প্রথমবারের মত চতুর্থ জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগ দেয়। এ ক্ষেত্রে ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ভূমিকা কখনো এক ছিল না। বরং ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্স সম্মেলনে বাংলাদেশের ভূমিকা ১৯৭১ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় সৃষ্ট ভারত-সোভিয়েত রাজনৈতিক অক্ষ দ্বারা প্রভাবিত থাকলেও, ১৯৭৬ সালের 'ন্যাম' সম্মেলনে বাংলাদেশ আধিপত্যবাদ তথা পরোক্ষভাবে ভারত বিরোধী একটা অবস্থান নেয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাভাবিক মিত্র তত্ত্বের বিরোধীতা করে 'ন্যাম' এর নরমপন্থী গ্রুপের সাথে নিজেকে সম্পর্কিত করেছিল। ইরান-ইরাক যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ বাগদাদে 'ন্যাম' সম্মেলন আয়োজনেরও বিরোধীতা করেছিল।

জোটনিরপেক্ষতা বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির অন্যতম উপাদান। স্বাধীনতার পর পরই জোটনিরপেক্ষতাকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। শেখ মুজিব বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড বানাতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয় স্বাধীনতার পরপরই দেশে ফিরে এসে শেখ মুজিব ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, স্বাধীন বাংলাদেশ 'সিয়াটো' এবং 'সেন্টো' সামরিক জোটের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবে না। এ থেকেই বোঝা যায় বাংলাদেশ প্রথম থেকেই জোট বহির্ভূত থাকার একটা প্রচেষ্টা নিয়েছিল। তবে এটা সত্য যে, সামরিকভাবে বাংলাদেশ কোন বৃহৎ শক্তির সাথে জড়িয়ে না গেলেও শেখ মুজিবের শাসনামলে সোভিয়েত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নানা বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল এবং বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। মুজিব পরবর্তী বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ মুজিবের রাজনীতির বিরোধিতা করলেও, মুজিব প্রণীত জোটনিরপেক্ষ নীতি অপরিবর্তিত থাকবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। এমন কি হাভানা সম্মেলনেও (১৯৭৯) প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ঘোষণা করেছিলেন যে, জোটনিরপেক্ষতা হচ্ছে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির অন্যতম উপাদান। প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও বেগম জিয়াও জোটনিরপেক্ষতার এই নীতি থেকে বিচ্যুত হননি। এমনকি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও তাঁর বৈদেশিক নীতিতে জোট নিরপেক্ষতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের কারণ অনুসন্ধান করে তিনটি দিক নির্দেশ করেছেন। এক. শর্তহীন বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, দুই. অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও আঞ্চলিক শান্তি প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হওয়া এবং তিন. বৃহৎ শক্তির রাজনৈতিক মেরুকরণে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করা। অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদের মতে বৃহৎ কোন শক্তির সাথে বাংলাদেশ যদি সম্পর্কিত হয়, তাহলে সংগত কারণেই

www.pathagar.com

বাংলাদেশকে অপর বৃহৎ শক্তির বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে। এক্ষেত্রে ঋণ প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাঁধাগ্রস্ত হতে পারে। এ কারণেই বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। ভিরেন্দ্র নারায়ন মনে করেন যেহেতু জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন একটি কনসেপ্ট হিসেবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা কমাতে সাহায্য করেছে, এবং নিজের উন্নয়নের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, সে কারণেই মুজিব জোটনিরপেক্ষতাকে তার বৈদেশিক নীতির অন্যতম উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। শওকত হাসান ১৯৭২ সালের সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের অবস্থানকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলছেন যে, আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখেই বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। কেননা বেশ কিছু দেশ, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের বেশ কিছু দেশ তখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগ দিয়ে বাংলাদেশ তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে চেয়েছিল। তবে এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল। প্রতিটি রাষ্ট্রই তার নিজের প্রয়োজন ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে সংগতি রক্ষা করে জাতীয় নীতি প্রণয়নের জন্য তার বৈদেশিক নীতি রচনা করে থাকে। এ ক্ষেত্রে তার জাতীয় স্বার্থটাই মুখ্য। ফ্রাংকেল এ জন্যই বলেছেন, জাতীয় স্বার্থ হল পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে মূখ্য ধারনা। আর এই জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে গিয়ে যে সব বিষয় বিবেচনায় আনা হয়, সেগুলো হচ্ছে ভৌগলিক ও সামরিক অবস্থান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মতাদর্শগত পরিবেশ, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভূমিকা ও আচরণ ইত্যাদি। হোলেষ্টির ভাষায় রাষ্ট্রের কোন উদ্দেশ্য অন্যরাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। জুলেস ক্যামবনের মূল্যায়নও অনেকটা তেমনি। ক্যামবনের মতে, যে কোন দেশের ভৌগলিক অবস্থান তার বৈদেশিক নীতির অন্যতম উপাদান। বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে আমরা এটা প্রত্যক্ষ করি। বিশেষ করে ভৌগলিক অবস্থানের কারণে ভারতের সাথে একটা বিশেষ সম্পর্ক স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল। এবং এই বিশেষ সম্পর্ক বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি প্রনয়নে প্রভাব বিস্তার করেছিল। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা পালন মূলত এ প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছিল। বাংলাদেশ ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত মোট ৯টি জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে শেখ মুজিব (১৯৭৩), বেগম জিয়া (১৯৯২) সংসদীয় রাষ্ট্র কাঠামোয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া (১৯৭৯) ও এরশাদ (১৯৮৯) অংশ নেন

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট হিসেবে। অন্যদিকে বিচারপতি সায়েম (১৯৭৬) ও জেনারেল এরশাদ (১৯৮৩) প্রধান সামরিক প্রশাসক তথা প্রেসিডেন্ট হিসেবে শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন। সামরিক সরকারের অধীনে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মিজান চৌধুরী হারারে সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন ১৯৮৬ সালে। বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ ডারবান সম্মেলনে যোগ দেন।

শীর্ষ সম্মেলনগুলোতে বাংলাদেশ কখনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন না করলেও বাংলাদেশের বক্তব্য বহুবার সমাদৃত হয়েছে। সত্তর দশকে জোটকে যখন সোভিয়েত ভিত্তিক হিসেবে পরিচালিত করার একটা উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, তখন বাংলাদেশ এর বিরোধিতা করেছে এবং জাকার্তার একাদশ শীর্ষ সম্মেলন (১৯৯৫) পর্যন্ত বাংলাদেশ একটি নরমপন্থী রাষ্ট্র হিসেবে তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে পেরেছিল। এক্ষেত্রে শওকত হাসানের ভাষায় বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালের শেষ পর্যন্ত জোটনিরপেক্ষ থেকেছে, কিন্তু তাতে একটা সোভিয়েতপন্থী সুর ছিল, অন্যদিকে ১৯৭৬ সাল থেকে বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ থেকেছে। কিন্তু তাতে একটি মার্কিনপন্থী সুর রয়েছে। স্পষ্টতই শওকত হাসান ১৯৭২-৭৫ সময়সীমায় বাংলাদেশের সাথে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক ও সোভিয়েত বক্তব্য দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কথা বলতে চেয়েছেন।

'ন্যাম' শীর্ষ সম্মেলনগুলোতে বাংলাদেশের বক্তব্য যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে বাংলাদেশ কতগুলো বিষয়ে একই ধরনের বক্তব্য রেখেছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে সরকার পরিবর্তন ঘটলেও এসব নির্দিষ্ট বিষয়ে সরকারী নীতির কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এই সব নির্দিষ্ট বিষয়ের মাঝে রয়েছে প্যালেষ্টাইন ও দক্ষিণ আফ্রিকার শোষিত ও নিষ্পেষিত জনগণের প্রতি সমর্থন, নিরস্ত্রীকরণ প্রসঙ্গ, ভারত মহাসাগরকে একটি শান্তি এলাকা হিসেবে ঘোষণার দাবি ইত্যাদি। বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে প্যালেস্টাইনীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও তাদের জন্য একটা আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিকে সমর্থন করে আসছে। প্যালেষ্টাইনীদের প্রতিনিধিত্বকারী পিএলওকে বাংলাদেশ স্বীকার করে এবং প্যালেষ্টাইন স্বশাসিত এলাকার প্রধান ইয়াসির আরাফাতকে রাষ্ট্রপতির সম্মান দিয়ে থাকে। ইসরাইল কর্তৃক অধিকৃত আরব এলাকা আরবদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল (প্রস্তাব নং ২৪২ ও ৩৩৮), বাংলাদেশ সে প্রস্তাবকে সমর্থন করে। ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে শেখ মুজিবর রহমান প্যালেস্টাইনীদের ন্যায়সঙ্গত দাবি দাওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশের সমর্থনের যে কথা ব্যক্ত করেছিলেন, ১৯৯২ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত দশম শীর্ষ সম্মেলনেও বেগম খালেদা জিয়া সেই সমর্থনের কথা

www.pathagar.com

পুনর্ব্যক্ত করেছেন। ডারবান শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। তাতেও প্যালেষ্টাইনীদের দাবী দাওয়ার প্রতি সমর্থন জানানো হয়। বাংলাদেশ একই সাথে হারারোয় অনুষ্ঠিত অষ্টম সম্মেলনে (১৯৮৬), বেলগ্রেড নবম সম্মেলনে (১৯৮৯) ও জাকার্তায় অনুষ্ঠিত দশম শীর্ষ সম্মেলনে (১৯৯২) মধ্যপ্রাচ্য শীর্ষক একটি শান্তি আলোচনা শুরু করা ও তা অব্যাহত রাখার দাবি করেছিল। এ নীতির কোন পরিবর্তন হয়নি। হারারে সম্মেলনে বাংলাদেশ ইহুদীবাদকে বর্ণবাদের সাথে তুলনা করে। ১৯৮৯ সালে বেলগ্রেড শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ ইন্তিফাদা আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। বেলগ্রেড শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিয়ে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেছিলেন প্যালেস্টাইনীদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরে আসবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ বরাবর সোচ্চার। বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্স শীর্ষ সম্মেলনে বর্ণবাদের সমালোচনা করেছিল। ১৯৯২ সালেও বাংলাদেশ একই বক্তব্য রেখেছে। এক্ষেত্রে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে ক্ষমতায় ছিল আওয়ামী লীগ আর ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন (বেলগ্রেড ১৯৮৬), এএনসির নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার মুক্তি (নতুন দিল্লী, ১৯৮৩), দক্ষিণ আফিকার প্রতি অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ (বেলগ্রেড, ১৯৮৬), ও দক্ষিণ আফ্রিকান বর্ণবাদ অবসানের লক্ষ্যে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের সমন্বয়ে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করার দাবি করে (জাকার্তা, ১৯৯২)। বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্স, ১৯৭৯ সালে হাভানায় ও ১৯৮৬ সালে বেলগ্রেড সম্মেলনে নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত ৪৩৫নং প্রস্তাববলে নামিবিয়ার স্বাধীনতাও দাবি করে। নিরস্ত্রীকরণ প্রসঙ্গেও বাংলাদেশের বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। ১৯৭৩ সলে বাংলাদেশ নিরস্ত্রীকরণের প্রথম দাবি উচ্চারণ করেছিল ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা কমিয়ে আনার দাবি করেছিল। ১৯৭৯ সালে হাভানা সম্মেলনে বাংলাদেশ দাঁতাত এর উপর গুরুত্ব দেয়। ১৯৮৬ সালে বেলগ্রেড সম্মেলনে পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করে পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা কমিয়ে আনার প্রস্তাব করে। একই সাথে বাংলাদেশ পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তির (এনপিটি) উপরও গুরুত্ব আরোপ করে। পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে দুই বৃহৎ শক্তির মাঝে জেনেভায় অনুষ্ঠিত অস্ত্র সীমিতকরণ সম্মেলনের প্রতিও বাংলাদেশ সমর্থন ব্যক্ত করে। ১৯৮৯'র শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ মহাশূন্যকে পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত রাখার প্রস্তাব করে। একই সাথে রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করারও দাবি করে। ১৯৯২ সালে

www.pathagar.com

জাকার্তায় বাংলাদেশ এনপিটি চুক্তি বাস্তবায়ন, আঞ্চলিক নিরস্ত্রীকরণ, অস্ত্র ব্যবসা সীমিতকরণ ও পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত এলাকা ঘোষণা করার দাবি উত্থাপন করে। এখানে বলে রাখা ভাল যে এনপিটি চুক্তি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর দক্ষিণ এশিয়ার দু'টো দেশ পাকিস্তান ও ভারত এক ধরনের পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে গেছে। ভারত প্রথম পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল ১৯৭৪ সালে, আর ১৯৯৮ সালের জুন মাসে ভারত দ্বিতীয় দফা পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর পাকিস্তানও একই সময়ে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। উপমহাদেশের দু'টো দেশের মাঝে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা কমানোর লক্ষ্যে অতীতে বুশ প্রশাসন ৫ জাতি শীর্ষক (ভারত, পাকিস্তান, চীন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র) একটি গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করেছিল। পাকিস্তান প্রথম দিকে এ প্রস্তাবে রাজী হলেও ভারত তাতে রাজী ছিল না। ভারতের যুক্তি গোলটেবিল বৈঠক করে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা কমানো যাবে না। কেননা, বিশ্বে এখনও পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদিত হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে, ভারত এনপিটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। বাংলাদেশ ১৯৭৯ সালে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। বাংলাদেশ মনে করে ভারতকে এনপিটি চুক্তির আওতায় আনা না গেলে উপমহাদেশে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বিস্তার লাভ করবে এবং এতে করে সার্ক এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

ভারত মহাসাগরকে একটি পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করার ব্যাপারেও বাংলাদেশ সোচ্চার ছিল। এক্ষেত্রে ধারণাগত দিক দিয়ে বাংলাদেশের বক্তব্যের কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় আলজিয়ার্স শীর্ষ সম্মেলনের পরে। আলজিয়ার্স সম্মেলনে ভারতীয় মহাসাগরকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত শান্তি এলাকা হিসেবে ঘোষণার সাথে সাথে সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় পারমাণবিক মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণার দাবি করেছিল বাংলাদেশ। পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলনগুলোতে এ দাবি থেকে বিচ্যুত না হলেও, বাংলাদেশের নীতিতে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ এই মহাসাগরকে পরমাণু মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করার দাবী করেছিল। ১৯৭৬ সালের কলম্বো সম্মেলনে বাংলাদেশের বক্তব্য মূল বিষয়কে না এড়িয়ে ভিন্ন বক্তব্য উপস্থাপন করেছিল। বাংলাদেশ বৃহৎ শক্তির অস্ত্র প্রতিযোগিতার কথা বলেছিল। একই সাথে দাবি করেছিল যে, ভারতীয় মহাসাগরের উপকূলবর্তী দেশগুলোর পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে 'হুমকি' ও বলপ্রয়োগের অপচেষ্টা যদি রোধ করা না যায়, তাহলে শান্তি এলাকার ধারণার মৃত্যু ঘটবে। শীর্ষ সম্মেলনে বিচারপতি সায়েম অংশগ্রহণ করে বলেছিলেন, বৃহৎ শক্তির মাঝে অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসান ঘটালেও এ অঞ্চলে শান্তি নিশ্চিত হবে না। বাংলাদেশ

www.pathagar.com

যে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিল, বিচারপতি সায়েমের এ বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে তা প্রকাশ পেয়েছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর মুজিবপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠীর ভারতে আশ্রয় গ্রহণ এবং সেখান থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাশকতামূলক কার্যকলাপ ইত্যাদির কারণে বাংলাদেশ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিল। একইসাথে ফারাক্কায় এক তরফাভাবে পানি প্রত্যাহার করে ভারত বাংলাদেশের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চাপ প্রয়োগ করেছিল। ১৯৭৫ সালের আগস্টের পর থেকেই বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে এবং বাংলাদেশ তার নিরাপত্তাহীনতা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে ধীরে ধীরে চীন, পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। কলম্বো সম্মেলনেই বাংলাদেশ ফারাক্কা সমস্যা আন্তর্জাতিকরণের উদ্যোগ নেয়। বাংলাদেশের জন্য সেটা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ও সরকারিভাবে ভারতের সাথে রাজনৈতিক সংঘর্ষে যাওয়া।

১৯৭৯ সালের হাভানা সম্মেলনেও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একই ধরনের বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন। জিয়া বলেছিলেন, বাংলাদেশ মনে করে বিদেশী সামরিক শক্তির উপস্থিতি এ অঞ্চলে উত্তেজনার জন্ম দিতে পারে। সুতরাং ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী। তবে পারস্পরিক বিশ্বাস, অন্যের অভ্যন্তরীণ ঘটনায় হস্তক্ষেপ না করার আহ্বানও তিনি জানিয়েছিলেন। স্পষ্টতই প্রেসিডেন্ট জিয়ার বক্তব্য ভারতের প্রতি লক্ষ্য করে প্রদত্ত হয়েছিল। তবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বাংলাদেশ তার নিরাপত্তার প্রশ্নে, বিশেষ করে ভারত কর্তৃক তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশংকার ব্যাপারে বক্তব্য কিছুটা নমনীয় করেছিল। ১৯৮০ সালের শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ 'হুমকি' বা বল প্রয়োগের কোন কথা সরকারীভাবে উল্লেখ করেনি। বাংলাদেশের বক্তব্যে ভারত মহাসাগরকে শান্তি এলাকা হিসেবে ঘোষণা করার ব্যাপারে কলম্বোতে আয়োজিত শান্তি সম্মেলনের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা হয়। এবং বলা হয়েছিল বাংলাদেশ মনে করে এ সম্মেলনের সাফল্য বৃহৎ শক্তি ও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সামরিক শক্তির অংশগ্রহণের উপরই নির্ভর করে। ১৯৮৬ সালে অষ্টম শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী একই ধরনের বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন। ১৯৮৯ ও ১৯৯২ সালের নবম ও দশম শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের এ ধরনের কোন বক্তব্য ছিল না। তবে ১৯৮৯ সালের বেলগ্রেড সম্মেলনে বাংলাদেশ আধিপত্যবাদের কথা বলেছিল। কোনো দেশের নাম উল্লেখ না করে প্রেসিডেন্ট এরশাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য যতদিন থাকবে, ততদিন জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের গুরুত্ব রয়ে যাবে। তিনি বলেছিলেন, ছোট ও দুর্বল

www.pathagar.com

দেশগুলো আজ অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর হুমকির সম্মুখীন। 'ন্যাম' তাদের অর্থাৎ ছোট ছোট দেশগুলোর নিরাপত্তা ও সংগতি নিশ্চিত করতে পারে। তিনি মন্তব্য করেছিলেন আমাদের উচিত হবে সদস্যভুক্ত দেশগুলোকে হুমকি ও বলপ্রয়োগের হাত থেকে রক্ষা করা। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো। সাধারণত কোন দেশের বৈদেশিক নীতিতে সে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রতিফলন ঘটে থাকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এরকম ঘটেছিল। বিশেষ করে বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্কের অবনতি ও ভারতের ব্যাপারে বাংলাদেশের ভূমিকা, তার বৈদেশিক নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছিল। সে কারণেই দেখা যায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আসরে বল প্রয়োগ, হুমকি ও আধিপত্যবাদের কথা বলে তার নিরাপত্তার প্রশ্নটাকেই মুখ্য করতে চেয়েছিল। একই সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'অত্যাচারী' ও 'অত্যাচারিত' কথা উল্লেখ করে শেখ মুজিব বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যারা সমর্থন ও সহযোগিতা করেছিল, তাদেরকে প্রগতিশীল হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতকে তিনি এই দলে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। অভ্যন্তরীণভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করার যে চাপ ছিল এটা ছিল তারই ফলশ্রুতি।

বিদেশী আগ্রাসন বিশেষ করে আফগানিস্তান ও কম্পুচিয়ায় বহিঃশত্রুর হস্তক্ষেপ ও দখলের বিরুদ্ধেও বাংলাদেশ শীর্ষ সম্মেলনগুলোতে বক্তব্য রেখেছিল। ১৯৮৩ সালের সপ্তম শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ আফগানিস্তান ও কম্পুচিয়ার পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে দাবি করেছিল সেখানকার জনগণ কোন্ ধরনের রাষ্ট্রকাঠামো চায় সেটা সে দেশের জনগণের উপরই ছেড়ে দেয়া উচিত। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ এ দু'টো দেশ থেকে সকল বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি করে। কম্পুচিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 'আসিয়ানের' উদ্যোগকেও সমর্থন করে বাংলাদেশ। ১৯৮৯ সালের শীর্ষ সম্মেলনে কম্পুচিয়া থেকে ভিয়েতনামের সৈন্য প্রত্যাহারকেও বাংলাদেশ অভিনন্দন জানিয়েছিল। বাংলাদেশ মনে করে কোন দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সে দেশের জনগণের হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত। ১৯৯২ সালের জাকার্তা সম্মেলনে বাংলাদেশ এ দু'টো দেশের জনগণের ভূমিকা ও 'ন্যাম'-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। বাংলাদেশ বসনিয়া হারজেগোভিনায় ব্যাপক গণহত্যার নিন্দা করে। সাইপ্রাসের জাতিগত দ্বন্দ্বের অবসানের ব্যাপারে বাংলাদেশ ১৯৭৭ সালে আর্চবিশপ ম্যাকরিওস এবং দেংকাস-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি ও ১৯৭৯ সালে ক্লাইপ্রিয়ানু ও দেংকাস-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি সমর্থন করেছিল। বাংলাদেশ বারে বারে দুই কমিউনিটির মধ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে আলাপ-আলোচনা দাবি জানায় (হাভানা,

www.pathagar.com

১৯৭৯ ও হারারে, ১৯৮৬)। একই সাথে ইরান-ইরাক যুদ্ধের অবসান ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তির দাবীও করেছিল বাংলাদেশ (দিল্লী ১৯৮৩, হারারে ১৯৮৬, বেলগ্রেড ১৯৮৯)। শীর্ষ সম্মেলনগুলোতে বাংলাদেশ প্যালেস্টাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা, কিংবা নিরস্ত্রীকরণের বাইরেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে বক্তব্য রেখেছে। ১৯৭৩ সালের চতুর্থ জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের বক্তব্যের মাঝে আরো ছিল দারিদ্রতা দূরীকরণ, শিক্ষার হার বাড়ানো, সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মাঝে খাদ্য বিনিময়ের সহযোগিতা ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ বিভিন্ন জাতির মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন, উপনিবেশবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম অব্যাহত রাখার যে দাবি উত্থাপন করেছিল, সম্মেলন শেষে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে তা প্রতিফলিত হয়েছিল। ১৯৭৬ সালে পঞ্চম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের ঋণ সমস্যার কথা উল্লেখ করে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ রোধে একটি আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তাব রাখে। উক্ত পরিকল্পনায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের দীর্ঘস্থায়ী সমাধান ও দুর্যোগপূর্ব ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়। এই শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ নামিবিয়ার স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের অবসান ও প্যালেস্টাইনীদের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে যে বক্তব্য রেখেছিল, তা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে স্থান পায়। হাভানা শীর্ষ সম্মেলনে (ষষ্ঠ, ১৯৭৯) বাংলাদেশ নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলে এবং উত্তরের ধনীদেশ থেকে দক্ষিণের গরীব দেশগুলোতে সম্পদ স্থানান্তরের দাবি করে। বাংলাদেশ একই সাথে একটি খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও গরীব দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি 'সলিডারিটি ফান্ড' গঠনের প্রস্তাব করে। এ সম্মেলনে কম্পুচিয়ার প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে বড় ধরনের বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। ১৯৭৯ সালের জুনে কলম্বোতে সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির বৈঠকে কম্পুচিয়ার পলপট সরকারের প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করে নেয়া হলেও হাভানা সম্মেলনে কিউবার প্রচণ্ড বিরোধিতার ফলে পলপট সরকারের প্রতিনিধি (যারা কম্পুচিয়ার ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন) থিউ স্যাম্পানকে সম্মেলনে অংশগ্রহণে করতে দেয়া হয়নি। কিউবা সমর্থন করেছিল ভিয়েতনামের সমর্থনপুষ্ট ও ক্ষমতাসীন হেঙ সামিরিন সরকারকে। সম্মেলনে কম্পুচিয়ার আসন খালি রাখা হয়। সম্মেলনে সকল বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত, দাঁতাত, নামিবিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদের অবসান, উন্নয়নশীল বিশ্বের মাঝে সহযোগিতামূলক সম্পর্কে বৃদ্ধি শীর্ষক প্রস্তাব গৃহীত হয়। গৃহীত প্রস্তাবের অনেকগুলোই বাংলাদেশ উত্থাপন করেছিল। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ আরো যেসব প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল, তার মাঝে রয়েছে (১) উন্নয়নশীল বিশ্বের বাণিজ্যিক সমস্যা ও নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার

www.pathagar.com

নিশ্চিতকরণ, (২) উন্নয়নশীল বিশ্বকে দেয়া সাহায্যের পরিমাণ বাড়ান, (৩) ঋণ সমস্যা, (৪) আন্তর্জাতিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, (৫) উত্তর-দক্ষিণ সংলাপ ও দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বৃদ্ধি ইত্যাদি। দিল্লী সম্মেলনেও ইরান-ইরাক যুদ্ধ, ও কম্পুচিয়ায়-আফগানিস্তানে বিদেশী আগ্রাসনের প্রশ্নে সদস্যভুক্ত দেশগুলো বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কম্পুচিয়ায় ও আফগানিস্তান থেকে সকল বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি করে সম্মেলনে নরমপন্থী অংশে জড়িত থাকার কথা ঘোষণা করে। তবে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন ও নিজেদের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বৃদ্ধির বাংলাদেশের প্রস্তাব সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণায় স্থান পায়। ১৯৮৬ সালের হারারে সম্মেলনে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে লিবিয়ার সম্পর্কের অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে লিবিয়ার সাথে সংহতি প্রকাশ করে এবং যে কোন ধরনের সন্ত্রাসবাদের সমালোচনা করে। আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সম্পর্কের প্রশ্নে বাংলাদেশ সার্ক-এর গুরুত্বের কথা তুলে ধরে। এন্টার্কটিকা চুক্তির সমর্থন ও এ মহাদেশকে সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাও বাংলাদেশ তুলে ধরে। বাংলাদেশ কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবগুলোর মাঝে আরো রয়েছে (১) ধনী দেশগুলোর কাছ থেকে সহজ সরল অর্থে সাহায্যের পরিমাণ বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া, (২) উন্নয়নশীল বিশ্বের সম্পদ বাড়ানো, (৩) বিশ্বব্যাংকের অর্থের পরিমাণ বাড়ানো, গরীব দেশগুলোর খাদ্য, কৃষি, জ্বালানী খাতে সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা, (৪) ট্রেড এন্ড ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করে গরীব দেশগুলোর ঋণ মওকুফ করে দেয়া, (৫) অর্থনৈতিক সংকট মোকিবিলায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা, ও (৬) গ্যাট আলোচনায় গরীব দেশগুলোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা ইত্যাদি। সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণায় বাংলাদেশের অনেক প্রস্তাব (বিশেষ করে লিবিয়ার উপর মার্কিন হামলা, প্যালেস্টাইন ও নামিবিয়ার স্বাধীনতা, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ অবসান, কম্পুচিয়া ও আফগানিস্তান শীর্ষক প্রস্তাব) গৃহীত হয়। ১৯৮৯ সালের নবম সম্মেলনে বাংলাদেশ ঋণ সমস্যা, ধনী ও গরীব দেশের মাঝে পার্থক্য কমানো, পরিবেশগত সমস্যা, সংরক্ষণবাদ, উত্তর-দক্ষিণ সংলাপ ইত্যাদি প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখে। বাংলাদেশের প্রস্তাবে নতুন আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা, দক্ষিণ-দক্ষিণ সংলাপ ও বিশ্ব আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের জন্য একটি আঞ্চলিক সেমিনারের কথাও বলা হয়েছিল। সম্মেলন শেষে সমাপ্তি ঘোষণায় বলা হয় যে, অতীতের পথ অনুসরণ না করে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তনের জন্য জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হবে। ঘোষণায় আরো বলা হয়, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক সংকটের উপর বিশেষ

www.pathagar.com

গুরুত্ব আরোপ করবে। ঐ ঘোষণায় স্বল্পোন্নত দেশের পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ হস্তান্তর, উন্নয়নশীল দেশসমূহের বাহ্যিক ঋণগ্রস্ততার দীর্ঘস্থায়ী ও স্থায়ী সমাধান, সংরক্ষণের বাঁধ ভেংগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদারনৈতিকরণ, লাভজনক পণ্যমূল্য ও স্থিতিশীল আর্থিক ব্যবস্থার আহ্বান জানান হয়। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কিছু কিছু প্রস্তাব মূল ঘোষণায় ঠাঁই পেয়েছিল। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ভারত মহাসাগরকে শান্তির অঞ্চলরূপে ঘোষণার প্রতি সমর্থন জানালেও বাংলাদেশ সম্মেলনে এ প্রসঙ্গে কোন বক্তব্য রাখেনি। একই সাথে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের কার্যকারিতা, আধুনিকীকরণ ও নতুন দৃষ্টিভংগির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হলেও বাংলাদেশ এ প্রসঙ্গে নিরব থেকেছে। স্নায়ুযুদ্ধ অবসান ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেংগে যাবার পর জাকার্তায় অনুষ্ঠিত দশম শীর্ষ সম্মেলন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্মেলনে 'ন্যাম'-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এ ব্যাপারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় 'ন্যাম'-এর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, ঐতিহাসিকভাবে দুই বৃহৎ শক্তির মাঝে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটলেও জাতিগত সংঘর্ষ, পরিবেশগত সমস্যা ইত্যাদির কারণে 'ন্যাম'-এর প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে। বেগম খালেদা জিয়া আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে পানি সম্পদ ব্যবহার নিশ্চিত করা, পরিবেশগত সমস্যা, উদ্বাস্তু ও অর্থনৈতিক শরণার্থীদের ব্যাপারে একটা উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানান। বাংলাদেশ একই সাথে নিবারক কূটনীতির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের কথাও বলে। উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে বেগম জিয়া যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের মহাসচিবের সাথে দেখা করার সময় নিবারক কূটনীতির কথা বলেছিলেন। উদ্দেশ্য, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার নিষ্পত্তি। স্নায়ু যুদ্ধোত্তর দেশে দেশে যে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে, জাকার্তা সম্মেলনে সে কথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন এবং এ ধারা অব্যাহত রাখার কথাও বলেছিলেন। সংরক্ষণবাদ এবং নতুন নতুন যে সব ট্রেড ব্লক গড়ে উঠেছে তার কারণে শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে বলেও তিনি মন্তব্য করেছিলেন। একই সাথে ঋণ সমস্যা, বাণিজ্য সম্পর্কিত উরুগুয়ে রাউন্ড আলোচনায় একটা সমাধান, দরিদ্রতা ও জনসংখ্যা রোধে 'ন্যাম'-এর ভূমিকা–উত্তর-দক্ষিণ সংলাপ, উন্নয়নশীল বিশ্ব ও উন্নত বিশ্বের মাঝে একটা অংশীদারিত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারেও খালেদা জিয়া প্রস্তাব রাখেন। বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনে (রিওডি জেনিরিও, ১৯৯২) গৃহীত প্রস্তাবাবলি কার্যকরণের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন এবং সেই অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান। সম্মেলনের ঘোষণায় প্যালেষ্টাইনীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণের প্রতি সংহতি প্রকাশ, উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে

www.pathagar.com

পার্থক্য কমিয়ে আনার দাবি সংবলিত প্রস্তাবে বাংলাদেশের বক্তব্য স্থান পেলেও, দশম সম্মেলনের মূল দাবি ছিল ন্যায়বিচার ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা ও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কাঠামোগত পরিবর্তন।

উপসংহার

দশম 'ন্যাম' শীর্ষ সম্মেলনে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কাঠামোগত পরিবর্তনের যে দাবি উত্থাপিত হয়েছে, তা আগামী দিনে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম আলোচ্যসূচীতে স্থান পাবে বলে মনে হচ্ছে। 'ন্যাম'-এর জন্মলগ্নে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ বিরোধী ভূমিকা ছিল মুখ্য। সায়ত্রিশ বছর পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পরিবর্তন এসেছে, যা খুব স্বাভাবিক কারণেই 'ন্যাম'-এর কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করবে। জাতিসংঘের কাঠামোগত পরিবর্তনের দাবি এভাবেই এসেছে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে 'ন্যাম'-এর সদস্যভুক্ত কিছু কিছু দেশের (বিশেষ করে ভারত, মিসর) নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদের দাবির গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো। দশম শীর্ষ সম্মেলনে কিউবার ভাইস প্রেসিডেন্ট আলমিদা বঙ্ক বলেছিলেন, বৃহৎ শক্তিগুলো উন্নয়নশীল দেশসমূহের উপর তাদের শেষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মডেল চাপিয়ে দেয়ার জন্য জাতিসংঘ ব্যবহার করছে। এ জন্যই দরকার পরিবর্তনের। ইরাকের ভাইস প্রেসিডেন্ট তাহা ইফাসিন রমজান বলেছিলেন, নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তে যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছা–অনিচ্ছাই প্রতিফলিত হয়। সুতরাং নিরাপত্তা পরিষদের কাঠামোয় উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত। বাংলাদেশ এব্যাপারে কোন বক্তব্য রাখেনি এবং বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিতে এমুহূর্তে বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পাচ্ছেনা। আগামীদিনে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে দুটি বিষয় বেশী করে প্রাধান্য পাবে। এর একটি হচ্ছে ঋণ সমস্যা ও দ্বিতীয়টি হচ্ছে সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মাঝে দ্বি-পাক্ষীক সমস্যা। উন্নয়নশীল বিশ্বের ঋণ সমস্যা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আসরে দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত হয়ে আসছে। এ ঋণের পরিমাণ গত দশ বছরে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ১৯৮০ সালে উন্নয়নশীল বিশ্বে ঋণের পরিমাণ যেখানে ছিল ৫৮২ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার, ১৯৯২ সালে এর পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১ দশমিক ৪৫০ মিলিয়ন ডলার। বর্তমান হিসাব অনুযায়ী এর পরিমণ ২ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশী। গরীব দেশগুলোর অনেককেই এখন তাদের বৈদেশিক আয়ের একটা বড় অংশ ঋণের সুদ হিসেবে দিতে হয়। বাংলাদেশও এই ঋণ সমস্যায় আক্রান্ত। ১৯৯৮ সাল নাগাদ বাংলাদেশের ঋণ পরিশোধ সংকট অত্যন্ত গুরুতর পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবে বলে বিশ্বব্যাংকের এক সামগ্রিক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৭১ সাল

www.pathagar.com

থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সাহায্য পেয়েছে ২ হাজার ৪শ ১৯ কোটি ডলার, এর মাঝে অনুদান পাওয়া গেছে ১১শ ৮৫ কোটি ডলার। ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের দেনার পরিমাণ ছিল ১২ হাজার ২শ ৩ কোটি ডলার। ১৯৯১-৯২ সালে বাংলাদেশ ঋণ পরিশোধ করেছে প্রায় ৪২০ মিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ ৪২ কোটি ডলার। ঐ সময় রফতানি আয় ধরা হয়েছিল প্রায় ২১৫১ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ রফতানি আয়ের প্রায় ১৯ দশমিক ৫ ভাগ ব্যয় করতে হয়েছে দেনা মেটাতে। অথচ ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশ ঋণের দেনা পরিশোধ করেছিল মাত্র ১৭ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার। যদিও ঋণের পরিমাণ এ সময় কম ছিল। সুতরাং বৈদেশিক ঋণের এই সংকটজনক পরিস্থিতি বাংলাদেশের বক্তব্যে প্রতিফলিত হবে এটাই স্বাভাবিক। 'ন্যাম' সম্মেলনগুলোতে বাংলাদেশ তার বৈদেশিক ঋণের সমস্যার কথা তুলে ধরে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমস্যার কথাই বলতে চেয়েছে। এ ব্যাপারে কিছুটা হলেও বাংলাদেশের সাফল্য লাভ করেছে, তা বলা যায়। কেননা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলোতে বাংলাদেশের বক্তব্য স্থান পেয়েছিল।

দ্বি-বার্ষিক সমস্যা নিয়ে একটা জটিলতা প্রায়শই দেখা যায়। বাংলাদেশ তার পানি সমস্যার কথা ফোরামে তুলেছিল। পাকিস্তান বেলগ্রেড সম্মেলনে (নূসরাত ভুট্টো, ১৯৮৯) ও জাকার্তা সম্মেলনের (নওয়াজ শরীফ, ১৯৯২) কাশ্মীর প্রশ্ন তুলেছে। একই সাথে ভারত সন্ত্রাসবাদ প্রশ্নে পাকিস্তানকে দায়ি করে প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। এমন কি পাঞ্জাবের ব্যাপারেও ভারত পাকিস্তানকে দায়ি করেছে (১৯৯২)। এ ধরনের দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা আগামীতে আরো উঠতে পারে। কেননা 'ন্যাম' শীর্ষ সম্মেলনে যে দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা তোলা যাবে না, এমন কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই। বাংলাদেশ ভারতের সাথে তার দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা, বিশেষ করে তার পানি সমস্যা বিভিন্ন আঞ্চলিক ফোরামে উত্থাপন করে কতটুকু লাভবান হয়েছে, তা ভিন্ন ব্যাপার। তবে বাংলাদেশ 'ন্যাম'কে এ ব্যাপারে সাময়িকভাবে একটা 'কৌশলগত' ফোরাম হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছে বলে মনে হয়। কেননা ১৯৭৬ সালের কলম্বো সম্মেলনের পর বাংলাদেশ ভারতের সাথে দ্বি-পাক্ষিক কোন সমস্যা আর 'ন্যাম' ফোরামে তোলেনি। বাংলাদেশের পানি সমস্যাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল। ১৯৯৩-এর ১ অক্টোবর জাতিসংঘে ও ২১ অক্টোবর কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বাংলাদেশের পানি সমস্যা আন্তর্জাতিক ফোরামে তুলে ধরেছিলেন। ভারত বাংলাদেশের এই ভূমিকাকে সমালোচনা করে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ ভারতের সাথে একটি পানি চুক্তি করলেও, তা নিয়ে বিতর্ক রয়ে গেছে। বাংলাদেশ আবারো কৌশলগত কারণে আগামী 'ন্যাম' সম্মেলনে ভারতের সাথে দ্বি-পাক্ষিক কোন সমস্যা 'ন্যাম' ফোরামে তুলবে কিনা, তা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না।

www.pathagar.com

নতুন আরো একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে দশম শীর্ষ সম্মেলনে। আর সেটি হচ্ছে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে ৭৭ জাতি অর্থনৈতিক সহযোগিতা ফোরামের সাথে একত্রিত করা। পশ্চিমা ধনী গোষ্ঠী এটা চাইবে। ১৯৬৪ সালে জাতিসংঘের অধীনে বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সম্মেলনে উন্নয়নশীল দেশসমূহ একত্রে মিলিত হয়ে একটি গোষ্ঠী গঠন করেছিল। উদ্যোক্তাদের সংখ্যা ৭৭ ছিল বলেই এর নাম গ্রুপ-৭৭ হয়েছে। পরে এর সদস্যা সংখ্যা বেড়ে ১২৫-এ গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু 'ন্যাম' জি-৭৭ হিসেবেই থেকে যায়। এই গ্রুপের সদস্যরা সবাই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য। উত্তরের ধনী ও দক্ষিণের গরীব দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনার জন্য গ্রুপ-৭৭ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ ক্ষেত্রে গ্রুপ-৭৭'র সাথে 'ন্যাম'-এর সহযোগিতামূলক সম্পর্ক আগামীতে বৃদ্ধি পাবে এবং তারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করবে। কিন্তু তাই বলে 'ন্যাম' এর বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। বাংলাদেশ 'ন্যাম'কে একটি কার্যকরী প্রতিষ্ঠান হিসেবেই দেখতে চায় এবং চায় 'ন্যাম' উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করুক। স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেংগে যাবার ফলে এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে ওঠার একটা প্রবণতা ইতোমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তির হুমকির মূখে 'ন্যাম 'উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন কখনো একটি আলাদা জোট হিসেবে গড়ে ওঠে নি। যে কারণে 'ন্যাম'-এর কোন স্থায়ী সচিবালয় নেই। যদিও জাকার্তা সম্মেলনে এর প্রয়োজনীয়তার কথাটা উঠেছে।

বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে বরাবরই সক্রিয়। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ তার সমস্যার কথা তুলে ধরেছে। সময়ের পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে বাংলাদেশ 'ন্যাম' সম্মেলনে বিভিন্ন প্রস্তাব তুলে ধরেছে, যার বেশ কিছু সমাপ্তি অধিবেশনে গৃহীতও হয়েছে। আগামী দিনগুলোতেও বাংলাদেশের এই ভূমিকার কোন পরিবর্তন ঘটবে না।

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ঃ ভিন্নতার স্বরূপ

তারেক ফজল*

বাংলাদেশকে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করার জন্য নয় মাসব্যাপী যে যুদ্ধ, এদেশের ইতিহাসে তা নিঃসন্দেহে প্রাতঃস্মরণীয় প্রসঙ্গ। এ জনপদের ভূমিপুত্র সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকাংশ কম-বেশী সক্রিয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় নিশ্চিত করেন। ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে যুদ্ধ, তাতে অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয়তার ভিন্নতা আছে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণ, প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য সবার এক নয়। বরং আলোচনায় দেখা যাবে, এসব ক্ষেত্রে বিস্তর ফারাক ছিলো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ব্যক্তি শ্রেণী, গোষ্ঠী ও দলের মাঝে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কারন, প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্যে ভিন্নতার ফলে ভিন্ন শ্রেণী-গোষ্ঠী দলের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের ভিন্ন চেতনারও সৃষ্টি হয়েছে এবং তা কম-বেশী অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে মুক্তিযুদ্ধে কার্যকর ভিন্ন ভিন্ন চেতনার স্বরূপ চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হবে।

স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা কবে থেকে শুরু হলো? আমার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের কখনো কখনো আচমকা প্রশ্ন করেছি। নানা পেশার মানুষদের মাঝেও কখনো গল্পচ্ছলে প্রশ্ন করেছি। জবাব পেয়েছি অনেকগুলো। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ (যেদিন থেকে সংবিধান কার্যকর হয়), ১০ এপ্রিল ১৯৭১, ১৭ এপ্রিল ১৯৭১, ২৬ মার্চ ১৯৭১। এই এক্কোগুলো জবাব আমি পেয়েছি স্বীকৃত শিক্ষিতজনদের কাছ থেকেই- যাদের সর্বোচ্চ সংখ্যা শতকরা ৪০ জন। বাকী ৬০ জনের প্রসঙ্গ এ পর্যায়ে প্রায় অবান্তরই বটে।

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ রাত ১১টা নাগাদ পাকিস্তানী বাহিনী সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করে, যাকে নৃশংস গণহত্যা বললেই কিছুটা অনুমান করা যায়। ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়ী থেকে দেশবাসীর অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বরিত শেখ মুজিব রাত ১১টা থেকে ১টার মধ্যে গ্রেফতার হন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছিলেন কি? দিয়ে থাকলে কখন দিয়েছিলেন? রাত ১১টায়, ১১.৩০টায়, ১২টায়, ১২.১০টায়, না ১২.৩০টায়? ১৯৭২ সালের ৭ এপ্রিল আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ

---

* রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক।

www.pathagar.com

মুজিব দাবী করেন তিনি চট্টগ্রামে জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে রাত ১১.৩০টায় ওয়ারলেস মেসেজ প্রেরণ করেন। ১৯৯৪ সালে আওয়ামী লীগ প্রচারিত ২৬ মার্চের এক বিজ্ঞাপনী ক্রোড়পত্রের এক লেখায় শেখ হাসিনা দাবী করেছিলেন, শেখ মুজিব ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১২.১০টায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রদান করেন। তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান ২৬ ও ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার দুটো ঘোষণা দিয়েছিলেন বলে দাবী করা হয়। সময় ও দিনের এ ভিন্নতা

সত্ত্বেও আমরা ২৬ মার্চকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করি। সুতরাং স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা ২৬ মার্চ শুরু হয়েছে, এটাই বলার কথা।

মূল প্রসঙ্গে ফেরা যাক। ভারতীয় সাংবাদিক অশোকা রায়না তার 'ইনসাইড র'ঃ দ্য স্টোরি অব ইন্ডিয়া'স সিক্রেট সার্ভিস' গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ৪ ভাগে ভাগ করেছেন; এক. ১৫-২০ বছর বয়স্ক সর্বস্তরের তরুণ-যুবক, দুই. আওয়ামী লীগের উগ্রবাদী তরুণ-যুবক সমন্বয়ে একদল, তিন. আধা সামরিক বাহিনী (ইপিআর), আনসার, মুজাহিদ, পুলিশ ও ফ্রন্টিয়ার গার্ডস ও চার. নিয়মিত বাহিনীর সৈনিকবৃন্দ বিশেষ করে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।' (পৃ-৫৫, বিকাশ পাবলিশিং হাউজ, ভারত)।

মস্কোপন্থী ন্যাপ নেতা, কিন্তু অস্থায়ী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের ঘনিষ্ঠজন, মঈদুল হাসান তার 'মূলধারা '৭১' শীর্ষক গ্রন্থে মুক্তিযোদ্ধাদের তিনটি ধারায় চিহ্নিত করেছেন। মঈদুল হাসান লিখেছেন ঃ' মার্চের পর থেকে প্রথম দশ দিনের মধ্যেই এই প্রতিরোধ সংগ্রামে তিনটি স্বতন্ত্র ধারা পরিস্ফুট হয়। প্রথম ধারা ছিল আক্রান্ত বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইপিআর-এর সেনা ও অফিসারদের সমবায়ে গঠিত। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সকল বাঙ্গালী সৈন্য ও অফিসারই যে এতে যোগ দিয়েছিল তা নয়। অনেকে নিরস্ত্রীকৃত হয়েছে, অনেকে বন্দী হয়ে থেকেছে, আবার অনেকে শেষ অবধি পাকিস্তানীদের পক্ষে সক্রিয় থেকেছে। .....মেজর জিয়ার ঘোষণা এবং বিদ্রোহী ইউনিটগুলোর মধ্যে বেতার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হবার ফলে এই সব স্থানীয় ও খণ্ড বিদ্রোহ দ্রুত সংহত হতে শুরু করে। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িত হবার বিষয়টি এদের জন্যে মূলত ছিল অপরিকল্পিত, স্বতঃস্ফূর্ত এবং উপস্থিত সিদ্ধান্তের ব্যাপার। এই যুদ্ধের রাজনৈতিক উপাদান সম্পর্কে এদের অধিকাংশের জ্ঞানও ছিল সীমিত। তবু বিদ্রোহ ঘোষণার সাথে সাথে পাকিস্তানী বাহিনী সীমান্ত পর্যন্ত এমনভাবে এদের তাড়া করে নিয়ে যায় যে, এদের জন্যে পাকিস্তানে ফিরে আসার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়। 'হয় কোর্ট মার্শাল নতুবা স্বাধীনতা'–এই দুটো ছাড়া অপর সকল পথই তাদের জন্য রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এমনিভাবে পাকিস্তানী আক্রমণের এক সপ্তাহের মধ্যে স্বাধীনতার

www.pathagar.com

লড়াই-এ শামিল হয় প্রায় এগার হাজার ইপিআর এবং ইপিআর-এর অভিজ্ঞ সশস্ত্র যোদ্ধা-কখনও কোন রাজনৈতিক আপোষ-মীমাংসা ঘটলেও দেশে ফেরার পথ যাদের জন্য ছিল বন্ধ, যতদিন না বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানীরা সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে দ্বিতীয় ধারার সমাবেশ ও গঠন প্রথম ধারার মত ঠিক আকস্মিক, অপরিকল্পিত বা অরাজনৈতিক ছিল না।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আওয়ামী যুব সংগঠনের চারজন নেতা শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমদ ও আবদুর রাজ্জাক সরাসরি কোলকাতায় এসে পড়েন। শেখ মুজিবের বিশেষ আস্থাভাজন হিসেবে পরিচিত এই চার যুব নেতারই আওয়ামী লীগের তরুণ কর্মীদের উপর বিশেষ প্রভাব ছিল। বিশেষ করে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে এই তরুণ নেতাদের ক্ষমতা অসামান্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ভারতে প্রবেশের পর থেকে তারা স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এক স্বতন্ত্র গোষ্ঠীগত ভূমিকা গ্রহণ করে। এদের নেতৃত্বে এবং ভারতীয় বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা 'Research and Analysis Wing (RAW)' -এর পৃষ্ঠপোষকতায় 'মুজিব বাহিনী'র নামে প্রবাসী সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এমন এক সশস্ত্র বাহিনীর জন্ম হয়, এক সময় যার কার্যকলাপ স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিভক্ত করে ফেলতে উদ্যত করে। এই সংস্থার সাথে তাদের যোগাযোগ সম্পূর্ণ আকস্মিক ছিল না। যতদূর জানা যায়, পাকিস্তানী শাসকবর্গ যদি কোন সময় পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াসী হয়, তবে সেই আপৎকালে আওয়ামী লীগপন্থী যুবকদের সশস্ত্র ট্রেনিং প্রদানের জন্য শেখ মুজিব ভারত সরকারকে এক অনুরোধ করেছিলেন। এই ট্রেনিং যে উপরোক্ত চার যুবনেতার অধীনে পরিচালিত হবে সে কথা সম্ভবত মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের কোন এক পর্যায়ে তিনি ভারত সরকারকে জানান।..... প্রতিরোধ যুদ্ধের তৃতীয় ধারা যদিও ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলধারায় পরিণত হয়, তবু সূচনায় তা না-ছিল বাঙালী সশস্ত্র বাহিনীর বিদ্রোহের মত অভাবিত, না-ছিল যুবধারার মত 'অধিকার প্রাপ্ত'। পাকিস্তানী আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে কার্যত সমগ্র আওয়ামী সংগঠন দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেয়।' (ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃঃ ৬-৮)

বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রেণীভাগের ক্ষেত্রে এ দুজন লেখকের অভিমতের সাথে আমি কিছু যোগ করতে চাই। অশোকা রায়না তার প্রথম শ্রেণীতে যে ১৫-২০ বছরের যুবকদের কথা বলেছেন, সেখানে বয়সের সীমাটি আরো বিস্তৃত করার প্রয়োজন। অর্থাৎ এই ভাগে যদি সাধারণ মানুষদের প্রসঙ্গ বলা হয়ে থাকে, যারা কম-বেশী সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তবে সে শ্রেণীতে অনেক পেশাজীবী এবং আরো বেশী

www.pathagar.com

বয়সী মুক্তিযোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। এক্ষেত্রে অশোকা রায়না যথার্থই 'সর্বস্তর'–এর উল্লেখ করেছেন। কারণ এইভাগে আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীর বাইরেও ভিন্ন রাজনৈতিক দলের-নেতা-কর্মীদের স্মরণ করা দরকার।

অন্যদিকে মঈদুল হাসান ৩ ধারার মুক্তিযোদ্ধার কথা লিখেছেন। এক্ষেত্রে তৃতীয় ধারায় কেবল আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীর উল্লেখ থাকায় তা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলমতের অনুসারী নেতা-কর্মী এবং সাধারণ মানুষদের উল্লেখও নির্দিষ্টভাবে করা দরকার।

এবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথায় আসা যাক। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ গণঅভ্যুত্থানের মুখে জেনারেল আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। জেনারেল ইয়াহিয়া প্রথমে সামরিক শাসন জারি করে পরে ক্রমশঃ বেসামরিক সরকার ও প্রশাসন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালুর লক্ষ্যে পরপর বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জেনারেল ইয়াহিয়ার এসব পদক্ষেপ রাজনীতিকদের ক্রমান্বয়ে আশান্বিত করে। ১৯৬৯-এর ২৮ নভেম্বর জেনারেল ইয়াহিয়া জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের হাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য চারটি বিকল্প সংবলিত একটি পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। বিকল্প চারটি ছিলো ঃ এক. একটি নির্বাচিত সাংগঠনিক কনভেনশন গঠন করে দেশের জন্য একটি সংবিধান রচনা করা, দুই. ১৯৫৬ সালের সংবিধানকে পুনরুজ্জীবিত করা, তিন. একটি সংবিধান তৈরী করে তার ওপর গণভোট অনুষ্ঠান এবং চার. প্রেসিডেন্ট কর্তৃক একটি আইনগত কাঠামো (লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক) তৈরী করা, যার ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। রাজনীতিকদের সাথে আলোচনা করে ইয়াহিয়া চতুর্থ বিকল্পটি গ্রহণ করেন। প্রতিশ্রুতি মতো ইয়াহিয়া ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ তার 'আইনগত কাঠামো আদেশ-লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার' (এলএফও) জারী করেন। এই এলএফও-র ২০ অনুচ্ছেদে ভবিষ্যৎ সংবিধানের কিছু মূলনীতি নির্দেশ করা হয়; এক. পাকিস্তান একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হবে এবং সেখানে ইসলামী আদর্শ সংরক্ষণ করা হবে, দুই. সার্বজনীন ভোটাধিকার, অন্যান্য মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতাসহ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা থাকবে এবং তিন. প্রদেশগুলোকে সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে যুক্তরাষ্ট্র ও প্রদেশের ক্ষমতা বন্টন করতে হবে।

সংবিধান প্রণয়নের সময়সীমা ও অনুমোদন বিষয়ে রাজনীতিকদের কিছু আপত্তি-প্রতিবাদের মোটামুটি সন্তোষজনক জবাব ইয়াহিয়া খানের পক্ষ থেকে পাবার পর প্রায় সব কটি রাজনৈতিক দল ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ ও ১৭ ডিসেম্বর

www.pathagar.com

প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামুদ্রিক জলোচ্ছাস (১২ নবেম্বর ১৯৭০) বিধ্বস্ত উপকূলীয় এলাকার নির্বাচন হয় ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারী। আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনকে ৬-দফার বিশেষত সর্বোচ্চ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে গণভোট হিসেবে আখ্যায়িত করে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩১৩ আসনের জাতীয় পরিষদে ১৬৭টি এবং ৩০০ আসনের প্রাদেশিক পরিষদে ২৮৮টি আসন লাভ করে।

এ পর্যায়ে জাতীয় পরিষদের সভা আহ্বান এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে মূল বাধা ও জটিলতা সৃষ্টি করেন পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো। ইয়াহিয়া খান একবার শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করলেও তার আহুত ৩ মার্চ ১৯৭১ তারিখের জাতীয় পরিষদের ঢাকা অধিবেশন তিনি ১ মার্চ ১৯৭১ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার তীব্র প্রতিক্রিয়া তথা হরতাল-ধর্মঘটের মুখে ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের কথা ঘোষণা করেন। ৭ মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী অসহযোগ কর্মসূচী শুরু হয় রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে। ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান কয়েকজন জেনারেল ও উপদেষ্টাসহ ঢাকায় এলেন এবং পরদিন থেকে মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা শুরু হলো। ২১ মার্চ ২০ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল সহ ঢাকায় এলেন। ২০ মার্চের বিবিসি-র এক সংবাদ ভাষ্যে মন্তব্য করা হয় 'পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সংকট দূরীভূত হচ্ছে'। (দৈনিক সংগ্রাম; ২১ মার্চ ১৯৭১)। ২২ মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর ৭৫ মিনিটব্যাপী ত্রিপক্ষীয় এক বৈঠক চলাকালে প্রেসিডেন্টের জনসংযোগ অফিসার সাংবাদিকদের জানান, 'প্রেসিডেন্ট ২৫ মার্চ আহুত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছেন। দেশের উভয় অংশের নেতাদের সাথে পরামর্শ করে এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমঝোতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সুবিধার জন্য প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।' (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিল পত্র, ২য় খণ্ড, পৃঃ-৭৭৫)। বৈঠকশেষে সাংবাদিকদের শেখ মুজিব জানালেন, 'আমাদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতেই অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছে' (প্রাগুক্ত, পৃ-৭৭৫-৭৭৬)। এদিন সন্ধ্যায় পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, 'দেশের বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক রাজনৈতিক সংকট নিরসনের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবুর রহমান ব্যাপক সমঝোতা এবং মতৈক্যে পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছেন। সমঝোতার শর্তগুলো তাঁর দল পরীক্ষা করে দেখছে।' (দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ মার্চ

www.pathagar.com

১৯৭১)। ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে সারা পূর্ব পাকিস্তানের পতাকার বদলে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়লো। এদিন উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক বাণীতে বললেন, 'নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যাতে একটি ও কার্যকরী ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলের উপযোগী সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্বিঘ্নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে পারেন সেজন্য বর্তমানে সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে।.... দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট অবশ্যই দূর হয়ে যাবে।' (দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ মার্চ, ১৯৭১)।

কিন্তু ২৩ মার্চ গেলো, ২৪ মার্চ গেলো, '২৫ মার্চ বেলা ৯টায় ভুট্টো ইয়াহিয়ার সাথে দেখা করলেন এবং ইয়াহিয়া ও মুজিবের উপদেষ্টারা যে শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছিলেন তার প্রতি চূড়ান্তভাবে তাঁর 'না'টা জানিয়ে দিলেন।..... সাংবাদিকদেরকে.....ভুট্টো বললেন, 'পূর্ব পাকিস্তান যে স্বায়ত্তশাসন চাচ্ছে তা স্বায়ত্তশাসনের সংজ্ঞার বিচারে সত্যিই স্বায়ত্তশাসন নয়,.....বিকেলে ঐ একই সোর্স (ক্যান্টনমেন্ট) থেকে মুজিবকে বলা হলো, ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেছেন।..... মুজিব বাড়িতে থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাজউদ্দিন ও আমি কয়েকজন বন্ধু সমেত হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আটকা পড়েছিলাম।.....ভুট্টো ১১০০ নম্বর স্যুটে অবস্থান করছিলেন। রাত সাড়ে ১২টার দিকে সেনাবাহিনীর ৫৮ থেকে ৬০ গাড়ীর একটি বহর প্রেসিডেন্ট হাউজ থেকে বেরিয়ে আমাদের হোটেল অতিক্রম করে বাঁ দিকে ঘুরে শাহবাগের দিকে চলে গেলো। সঙ্গে সঙ্গেই আমি হোটেল থেকে মুজিবের কাছে ফোন করলাম। ফোনটা ধরলেন হাজী মোরশেদ। আমি তাকে জানাতে বললাম যে, আমার আশঙ্কা আর্মি মুজিবের বাড়ী আক্রমণ করতে পারে। তাঁকে নিরাপদ স্থানে সরে পড়া দরকার। বারোটা পঞ্চাশ মিনিটে মুজিবের বাড়ী পুনরায় ফোন করলাম। এ সময়ও ফোনের অপর প্রান্তে হাজী মোরশেদকে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, মুজিব নিরাপদ জায়গায় সরেছেন কিনা। হাজী মোরশেদ কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'আমরা তাঁর পা ধরেছি এবং বারবার অনুরোধ করেছি বাড়ী থেকে সরে যাবার জন্য। কিন্তু তিনি রাজী নন। তিনি দেখতে চান তারা তাঁকে কি করে।' রাত ১টা ১০ মিনিটের সময় যখন আমি পুনরায় মুজিবের বাড়ীতে টেলিফোন করার চেষ্টা করলাম। টেলিফোনের লাইন কাটা। মুজিব রাত ১টা থেকে দেড়টার মধ্যে গ্রেফতার হন।' (মওদুদ আহমদ, বাংলাদেশ ঃ কন্সটিট্যুশনাল কোয়েস্ট ফর অটোনমি, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ-২৪৮-৪৯)। মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনার অন্যতম অংশগ্রহণকারী রেহমান সোবহান স্পষ্ট করেই লিখেছেন, 'ইয়াহিয়া প্রকৃতপক্ষে মুজিবের সব দাবী শুরুতেই মেনে নিয়েছিলেন। এই মেনে নেয়াটা ভুট্টোকে বিক্ষুব্ধ করেছিলো, যার ফলে তিনি পূর্ব ও

www.pathagar.com

পশ্চিম পাকিস্তানে পৃথকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর দাবী করলেন।' (নিগোশিয়েটিং ফর বাংলাদেশ ঃ এ পার্টিসিপেন্টস ভিউ; সাউথ এশিয়ান রিভিউ, ভলিউম-৪, সংখ্যা-৪ জুলাই ১৯৭১)।

১৯৬৯-র গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন থেকে ১৯৭১-র ২৫ মার্চ পর্যন্তকার এই ঘটনাবহুল সময়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করে আমি এখানে দু'টো বিষয় উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। এক. মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী অবস্থান, দাবী ও ভূমিকা চিহ্নিতকরণ এবং মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার প্রেক্ষাপট ও কারণ নির্দেশকরণ, দুই. বাংলাদেশে ইতিহাসের জঘন্য ও পৈশাচিক গণহত্যার দায়িত্ব নির্ধারণ। প্রথম ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি। ক. সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের শাসনভার পাবার জন্য নিয়মতান্ত্রিক সকল প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছে। খ. ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের আওতায় আওয়ামী লীগ সকল প্রদেশ/অঞ্চল এবং বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৬ দফা ভিত্তিক পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পেতে চেয়েছে। গ. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের উপস্থাপিত প্রস্তাবের সাথে একমত ছিলেন। ঘ. শেখ মুজিব বিভক্ত পাকিস্তান নয় বরং অবিভক্ত পাকিস্তানের শাসনভার লাভের জন্য সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সচেষ্ট, সক্রিয় এবং আশাবাদী ছিলেন। ঙ. নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ন্যায্য শাসনতান্ত্রিক সমাধানের সকল পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দিয়ে ভুট্টোর নির্দেশের কাছে নতি স্বীকার করে জেনারেল ইয়াহিয়া ও অন্য জেনারেলরা যখন দেশবাসীর ওপর গণহত্যা শুরু করে দিলো, তখন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিব বাংলাদেশকে 'স্বাধীন' বলে ঘোষণা করেন এবং পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীকে বাংলাদেশে 'হানাদার' শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের অশুভ থাবা থেকে মাতৃভূমিকে 'মুক্ত' করার জন্য 'মুক্তিযুদ্ধ' শুরু করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রের প্রসঙ্গটিও এ পর্যায়ে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায়। তা হলো, বাংলাদেশের জনগণের ওপর চালানো গণহত্যার মূল দায়িত্ব পিপল্‌স পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর। ইয়াহিয়া খান, পীরজাদা অথবা কসাই টিক্কা খান ছিলো ভুট্টোর সেই দানবীয়-পৈশাচিক কাজের অংশীদার। সুতরাং বাংলাদেশে গণহত্যা চালানোর জন্য আমরা যদি কারো দানবীয় ও কুৎসিত চেহারা আঁকি, তা হওয়া উচিৎ প্রথমে ভুট্টোর, তারপর ইয়াহিয়া বা টিক্কা খানের। এ কারনে আমি মনে করি, ভুট্টো, তার দল তার পরিবারের সদস্যদের সাথে আমাদের সকলের একটি 'সাধারণ বৈরিতা', পোষণ করা উচিত। এ পর্যায়ে আমরা পুনরায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চাই। ভারতীয় সাংবাদিক

www.pathagar.com

অশোকা রায়না বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চারটি শ্রেণীর কথা বলেছেন। তার মধ্যে শেষ দু'শ্রেণী তথা আনসার, পুলিশ, ইপিআর ও নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা মঈদুল হাসান কথিত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম ধারা। মঈদুল হাসানের ভাষায় 'এই যুদ্ধের রাজনৈতিক উপাদান সম্পর্কে এদের অধিকাংশর জ্ঞানও ছিল সীমিত। তবু বিদ্রোহ ঘোষণার সাথে সাথে পাকিস্তানী বাহিনী সীমান্ত পর্যন্ত এমনভাবে এদের তাড়া করে নিয়ে যায় যে, এদের জন্যে পাকিস্তানে ফিরে আসার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়। হয় 'কোর্ট মার্শাল' নতুবা 'স্বাধীনতা'–এই দুটো ছাড়া অপর সকল পথই তাদের জন্যে রুদ্ধ হয়ে পড়ে।' এই বাস্তবতায় এই ধারার সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কি ছিলো? এদের মূল চেতনা ছিলো নিশ্চয়ই পাক হানাদার বাহিনীকে পরাস্ত করার মাধ্যমে মাতৃভূমি স্বাধীন করা ও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করা। কারণ তাদের অধিকাংশের কাছেই 'এই যুদ্ধের রাজনৈতিক উপাদান' জানা ছিলো না। অন্য কোনো প্রসঙ্গও নয়।

অশোকা রায়না-র মুক্তিযোদ্ধা শ্রেণীভাগের এক নম্বরে যাদের কথা বলা হয়েছে, মঈদুল হাসান বর্ণিত মুক্তির তৃতীয় ধারায় তারাই 'ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলধারায় পরিণত হয়'। ১৫-২০ বছরের যুবক থেকে শুরু করে ৪০-৫০ বছরের প্রৌঢ়, নানা শ্রেণী ও পেশার মানুষেরা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো। সীমান্ত পার হয়ে তারা ভারতের বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে থেকেছেন। তারা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং দেশব্যাপী গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে পাক হানাদার বাহিনীকে সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত রেখে চূড়ান্ত পরাজয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আবার সীমান্ত পাড়ি না দিয়েও অনেকে দেশের ভেতর থেকেই গেরিলা যুদ্ধ করেছেন। তাদের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছিলো না, সরাসরি যুদ্ধের ময়দানেই তারা অন্য প্রশিক্ষিত সহযোদ্ধাদের কাছ থেকে নানান কৌশল শিখে নিয়েছেন। চলমান রাজনীতি সম্পর্কে এই বিপুল সংখ্যক লড়াকু মুক্তিযোদ্ধার কম-বেশী সচেতনতা ছিলো। মঈদুল হাসান তাদেরকে 'আওয়ামী লীগার' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আমার স্থির বিশ্বাস, এই শ্রেণীর মুক্তিযোদ্ধার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আওয়ামী লীগার ছিলেন বটে, তবে এর বাইরেও অন্যান্য দলের নেতা-কর্মী এবং নির্দলীয় অনেক যুবক-প্রৌঢ়ও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই ধারার মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের জন্য কি কি চেতনা বিদ্যমান ছিলো? একটি স্বাধীন, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিলো তাদের মূল টার্গেট। কারণ, রাজনীতি সচেতন হয়ে থাকলে গণতান্ত্রিক পরিবেশ লাভ তাদের অন্যতম কাঙ্ক্ষিত প্রসঙ্গ হবে, তা-ই স্বাভাবিক। শেখ মুজিব ঘোষিত ঐতিহাসিক ৬ দফার মূল বিষয় ছিলো দুটো ঃ ১. এ অঞ্চলের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) মানুষদের

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক মুক্তি তথা সমৃদ্ধি, পরে তিনি যাকে বলেছেন 'সোনার বাংলা'। ২. এ অঞ্চলের (পাকিস্তানের অন্য অঞ্চলে হলেও আপত্তি নেই) পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ নিজেকে নিজে শাসন করার অধিকার। ২৫ মার্চ দিবাগত গভীর/মধ্যরাতে স্বাধীনতার ঘোষনার মাধ্যমে পূর্ন স্বায়ত্বশাসনের দাবী 'পূর্ন স্বাধীনতা'য় রূপান্তরিত হয় এবং তত্ত্বগতভাবে তা অর্জিত হয়ে যায়। সেই 'অর্জন' তথা স্বাধীন বাংলাদেশকে পাক হানাদার বাহিনীর ছোবল থেকে মুক্ত করার জন্যই ছিলো মুক্তিযুদ্ধ। আর সেই মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্য চেতনাও তাই ৬ দফার চিহ্নিত অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা। এই ধারার মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যারা আওয়ামী লীগের বাইরে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক/সাম্যবাদী (কমিউনিস্টিক) রাজনীতি করতেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হিসেবে সমাজতন্ত্র/সাম্যবাদের চিন্তা থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্ত্র আওয়ামী লীগের আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা বা দলিলে সমাজতন্ত্রের কথা ছিল না। তারা বরং তাদের 'খসড়া প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণায়' 'ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান' অক্ষুণ্ন রাখেন (মওদুদ আহমদ, প্রাগুক্ত)।

মুক্তিযোদ্ধার শ্রেণীভাগে অশোকা রায়না যাদেরকে 'আওয়ামী লীগের উগ্রবাদী তরুণ-যুবক সমন্বয়ে একদল' বলে অভিহিত করেছেন, মঈদুল হাসানের ভাষায় তারাই 'অধিকার প্রাপ্ত' যুবধারা। 'শেখ মুজিবের বিশেষ আস্থাভাজন' এই ধারার চার যুবনেতা 'র'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় মুজিব বাহিনী গঠন করেন, 'যার কার্যকলাপ স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিভক্ত করে ফেলতে উদ্যত করে। 'র'-এর সাথে তাদের যোগাযোগ আকস্মিক ছিলো না'। শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদ-ছাত্রলীগের প্রাক্তন এই চার শীর্ষনেতা একাত্তরের মার্চের অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে তাদের প্রভাব বিস্তারকারী নেতৃত্ব প্রকাশ করতে সক্ষম হন।

এই চার যুবনেতার মধ্যে আবদুর রাজ্জাক এবং সিরাজুল আলম খান ১৯৬৪ সালে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ গঠন করেছিলেন। তাদের সাথে নিয়েছিলেন কাজী আরেফ আহমেদকে। এজন্য তারা সশস্ত্র বিপ্লবের প্রক্রিয়া চিহ্নিত করেছিলেন। এর আগে, ১৯৬২ সলে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের আহ্বান সংবলিত একটি লিফলেট তারা পান এবং সাধারণ্যে প্রচার করেন। আবদুর রাজ্জাকের দাবী অনুযায়ী, এ লিফলেটটি শেখ মুজিব তৈরী ও প্রচার করেছিলো। আবদুর রাজ্জাকের মতে, 'আমাদের রাজনীতি ছিল স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র, এ ব্যাপারে আমরা পরিষ্কার ছিলাম।' (মাসুদুল হক, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ-১৩০)। এই গোপন সংগঠন সম্পর্কে শেখ মুজিবকে তারা জানান ১৯৬৯ সালে এবং আরো ব্যাপক সংগঠন-

www.pathagar.com

ব্যাপকতম ঐক্যের জন্য ১৯৭১ সালের ১৮ জানুয়ারী শেখ ফজলুল হক মনি ও তোফায়েল আহমদকে তাদের সাথে নেন। স্বাধীন বাংলাদেশে শেখ ফজলুল হক মনি ও সিরাজুল আলম খানের মধ্যে আদর্শগত মতপার্থক্য শুরু হলে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের কথা সাধারন্যে জানাজানি হয়। এই বিপ্লবী পরিষদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শকে সামনে রেখে তারা সেই ১৯৬৪ থেকেই গোপন সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন এবং এর ফলে বিশ্বস্ত নেতা-কর্মী গড়ে তোলেন। ১৯৭০ সালের ১২ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ'-এর প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৭১-এর ১৮ জানুয়ারী এক বৈঠকে চার যুবনেতাকে শেখ মুজিব বলেছিলেন ঃ 'স্বাধীনতার প্রশ্নে সংগ্রাম করতে হবে এবং সশস্ত্র বিপ্লব করতে হবে। আমি তোমাদের জন্য সে ব্যবস্থা করে রেখেছি। তোমাদের চারজনকে কো-অর্ডিনেটর হিসেবে ঠিক করে যাব এবং সময়মতো যাতে সাহায্য পাও, অস্ত্র পাও-যাতে যুদ্ধ করতে পারো, সে ব্যবস্থা করবো। তিনি আরো বলেছিলেন, তাজউদ্দীন আহমদকে সঙ্গে নেবে। এ কথা তিনি আমাদের বলেছিলেন। ২৫ মার্চ রাতে যখন ক্র্যাকডাউন হয়ে যায়, তখন আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। আমাদের কাছে একটা ঠিকানা ছিল। আমার কাছেও ছিল। তাজউদ্দীন আহমদের কাছেও ছিল-যেখানে ভারতে কোলকাতায় গিয়ে দেখা হবে। ভাবলাম, নিশ্চয়ই তাজউদ্দীন আহমদ সেই ঠিকানায় চলে গেছেন। কোলকাতায় গিয়ে শুনলাম তিনি দিল্লী চলে গেছেন। ভাবলাম জায়গামত যাই। জায়গামত যেয়ে দেখি শেখ ফজলুল হক মণি ও তোফায়েল আহমদ। .....সে জায়গাটা কোলকাতায়-২১ রাজেন্দ্র রোড'; যেখানে চিত্তরঞ্জন সুতার বঙ্গবন্ধুর রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে ছিলেন।' (মাসুদুল হক, ১৯৯১, পৃ-১২৬)।

মঈদুল হাসান লিখছেন, 'সীমান্ত অতিক্রম করার আগে কয়েকবারই তাজউদ্দিন মনে করেছিলেন হয়তবা এই আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য উচ্চতর পর্যায়ে কোন ব্যবস্থা ভারত সরকারের সাথে করা হয়েছে। তাঁর এ কথা মনে করার বিশেষ একটি কারণ ছিল। ৫ অথবা ৬ মার্চে শেখ মুজিবের নির্দেশে তাজউদ্দিন গোপনে সাক্ষাৎ করেন ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার কে সি সেনগুপ্তের সঙ্গে। .....সীমান্ত অতিক্রমের আগে তাজউদ্দিন ভেবেছিলেন, হয়তো-বা ২৪ মার্চের আলাপ অন্য কারো মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে এবং সম্ভবত এই আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কোন ব্যবস্থা ইতোমধ্যেই করা হয়েছে। সীমান্তে পৌঁছুবার পর তাঁর আশাভঙ্গ ঘটে'।.....তাজউদ্দিন বুঝলেন, ভারতের সঙ্গে কোন ব্যবস্থাই নেই, কাজেই শুরু করতে হবে একদম প্রথম থেকে।.....এ সব বিচার বিবেচনা থেকে ইন্দিরা গান্ধীর

www.pathagar.com

সঙ্গে বৈঠকের সূচনাতে তাজউদ্দিন জানান যে, পাকিস্তানী আক্রমণ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে ২৫/২৬ মার্চের বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করে এক সরকার গঠন করা হয়েছে। শেখ মুজিব সেই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্ট.....সে জন্য তাজউদ্দিন দিল্লীতে সমবেত দলীয় প্রতিনিধিদের পরামর্শক্রমে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উপস্থিত করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন।' (মূলধারা '৭১, পৃ-৯-১২)

আবারো মাসুদুল হককে উদ্ধৃত করি, 'প্রধানমন্ত্রী তিনি নিজেকে ঘোষণা করলেন; এই হলো বিক্ষুব্ধতার কারণ। কারণ, বঙ্গবন্ধু ১৮ জানুয়ারীতে আমাদের সঙ্গে বসলেন; পরবর্তীতে তাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে বসে যে কথা বলেছিলেন; বলেছিলেন কমান্ড কাউন্সিল হবে এবং কমান্ড কাউন্সিলের মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হবে। এমন কী তিনি বলেছিলেন স্বাধীনতার পরেও এই কমান্ড কাউন্সিলের মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হবে পাঁচ বছর পর্যন্ত। পাঁচ বছর পর গণতন্ত্র এবং বহুদল ব্যবস্থা চালু হবে।..... আমরা তো সর্বাত্মক যুদ্ধ করতে পারিনি। আমাদের পরিকল্পনা ছিল-মুজিব বাহিনী প্রথমে ভেতরে ঢুকবে। তারপর অস্ত্রশালা তৈরী করবে। এরপর আশ্রয়স্থল গড়ে তুলবে। তারপর সংগঠন গড়ে তুলবে,-মুজিব বাহিনীর সংগঠন। এরপর থানা কমান্ড করবে। থানা কমান্ড করার পর প্রথম কার্যক্রমটা হবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী অর্থাৎ রাজাকারদের ওপর হামলা চালাবে, তাদের সরবরাহ লাইনের ওপর হামলা চালাবে। গেরিলা কৌশলে ওদের দুর্বল করে দেবে। সর্বশেষ হলো, ওরা যখন দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন পাক বাহিনীর ওপর আঘাত হানো। আমরা তখন এ কাজই করছি। প্রাথমিক কাজ আমাদের মোটামুটি হয়ে গিয়েছিল। সংগঠন আমাদের গড়ে উঠেছিল। আমাদের রিক্রুটমেন্ট হয়ে গিয়েছিল। আমাদের ট্রেনিংপ্রাপ্ত সদস্যরা যেখানে যেতে পেরেছে, সেখানেই থানা কমান্ড হয়ে গেছে। আমরা জনগণের সাথে মিলে যুদ্ধ করছি। কিছু কিছু রাজাকারও খতম হচ্ছে। কিন্তু মূল জায়গাটা মানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সামনে না পড়লে, যুদ্ধ করিনি। দু'চার জায়গায় সামনে পড়ে গেছি, লড়াই হয়েছে। আমরা তো যুদ্ধ শুরুই করিনি। আমাদের তো পাঁচ বছরের পরিকল্পনা। প্রথম বছরে কী করবো, তৃতীয় এবং চতুর্থ বছরে কী করবো। তারপর সরকার গঠন করবো। এই ছিল আমাদের সামগ্রিক পরিকল্পনা। আমরা যদি সফল হতাম তাহলে কোন ঘাস থাকতো না, আগাছা থাকতো না। সমাজদেহ থেকে আগাছা উপড়ে ফেলতাম। প্রতিবিপ্লবীদের থাকতে হতো না। হয় মটিভেট হয়ে এদিকে আসতে হতো, নইলে নিশ্চিহ্ন হতে হতো'। (আবদুর রাজ্জাকের সাক্ষাৎকার, পৃ-১২৬-২৭ ও ১৩৪-১৩৫)।

উপস্থাপিত উদ্ধৃতি ক'টি থেকে আমরা কয়েকটি অনুসিদ্ধান্তে আসতে পারি। এক.

www.pathagar.com

শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ চার যুবনেতা সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন এবং তাদের দ্বারা দীক্ষিত ও মুজিব বাহিনীর আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা একটি সমাজতান্ত্রিক স্বাধীন বাংলাদেশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন। দুই. শেখ মুজিবসহ এই চার যুবনেতা ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এবং কূটনৈতিকদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং 'ভারতীয় সূত্রে পৃষ্ঠপোষিত' ছিলেন। তিন. শেখ মুজিব প্রকাশ্যে মার্কিনঘেঁষা উদারগণতন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু গোপনে সমাজতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। চার. আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ সমাজতন্ত্রী নেতৃত্ব তাজউদ্দিন, সিরাজুল হোসেন খান, আমীর উল ইসলাম প্রমুখ আওয়ামী নেতৃত্বকে সি আই এ পন্থী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পাঁচ. কয়েক বৎসর আগে যে চিত্তরঞ্জন সুতার বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশকে নিয়ে 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রমূলক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলো, সেই চিত্ত সুতার শেখ মুজিবের প্রতিনিধি হিসেবে কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। এই তথ্যটি সামগ্রিকভাবে বিব্রতকর ও হতাশাব্যঞ্জক। এই তথ্যটি পাঠককে নির্দেশ করে মীরজাফর আর ক্লাইভের কথা-যারা আপন স্বার্থে চুক্তিবদ্ধ। শেখ মুজিব যে 'স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের' কথা বলতেন, এই তথ্যটি সেই দাবীকে মিথ্যা ও প্রতারণা হিসেবে চিহ্নিত করছে। একই সাথে এই তথ্য 'সংশ্লিষ্ট রাজনীতিকদের' 'এজেন্ট চরিত্রের' প্রকাশ ঘটাচ্ছে। ছয়. ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে সমাজতন্ত্রের কথা থাকলেও সে দেশের কংগ্রেসী রাজনীতিকরা সাবেক সোভিয়েত স্টাইলের সমাজতন্ত্র চাইতো না। তাই তারা আবদুর রাজ্জাক প্রমুখদের পরিকল্পিত 'সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ করেছেন তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে 'নিয়মিত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার' ও মুক্তিবাহিনীকে সমর্থন প্রদান করে এবং মুক্তিযুদ্ধকে প্রলম্বিত না করে নয় মাসের মাথায় তার সমাপ্তি নিশ্চিত করে। এ প্রসঙ্গে দেরাদুন-তানদুয়ার মুজিব বাহিনী প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের 'প্রশিক্ষণ বিষয়ক' জটিলতার উল্লেখ করা যায়। হাসানুল হক ইনু প্রমুখ প্রশিক্ষক তাদের বক্তৃতায় সমাজতন্ত্রের দীক্ষাদান অব্যাহত রাখলে ভারতীয় মেজর মালহোত্রা তাতে বাধা দেন এবং এর ফলে সেই ক্যাম্পে কয়েকদিন প্রশিক্ষণ বন্ধ রাখা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের ময়দানে অংশগ্রহণকারীদের বাইরে আরো অন্তত, তিন শ্রেণীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের চেতনা প্রশ্নে আমি কথা বলতে চাই। এক. মুক্তিযুদ্ধের কারণে ভারতে ও অন্যত্র আশ্রয়গ্রহণকারী কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক তথা বুদ্ধিজীবীবৃন্দ। জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ বুদ্ধিজীবীগণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে অনুভব করেন স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ, যেখানে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হবে সাধারণ জনগণের আর সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গন কুসুমাস্তীর্ণ হবে গণতান্ত্রিক

www.pathagar.com

মূল্যবোধের কাঙ্ক্ষিত অনুশীলনে। তাঁর 'যখন সময় এল' মুক্তিযুদ্ধকালীন স্মৃতির ধারক। এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর কেউ কেউ আবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে বোঝেন ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং নির্দিষ্ট করে ইসলাম-বিরুদ্ধতাকে। দুই. মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে অনেক পেশাজীবী-বুদ্ধিজীবী দেশত্যাগ করেন নি। উপরন্তু তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। এই শ্রেণীর পেশাজীবী-বুদ্ধিজীবীদের অনেকে পরবর্তী সময়ে নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা বলে দাবী করেছেন। কবি শামসুর রাহমান তেমন একজন মুক্তিযোদ্ধা। এই শ্রেণীর 'মুক্তিযোদ্ধারা' সাধারণভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হিসেবে প্রচার করেন। তিন. মুক্তিযুদ্ধকালে দেশে অবস্থানকারী কোটি জনতা, যারা প্রধানত, পাক বাহিনীর নানামুখী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় প্রদান–খাবার সরবরাহের মাধ্যমে সাহায্য করেছেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এই সাধারণ মানুষের কারো কাছে 'যুদ্ধের বছর', কারো কাছে 'গোলাগুলির বছর,' আবার কারো কাছে 'গণ্ডগোলের বছর' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই মানুষদের কাছে জটিল রাজনীতি কখনোই মুখ্য বিষয় নয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে এই মানুষেরা সাধারণভাবে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে একটি স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ দেশ বোঝে, যেখানে তারা খেয়ে-পরে, সুখে-শান্তিতে দিন যাপন করতে পারেন। আর ইলেকশনের সময় তারা নিজের ইচ্ছেমতো প্রার্থীকে ভোট দিতে পারার পরিবেশকে বোঝেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অনুসন্ধানের দীর্ঘ নিবন্ধের উপসংহারে কয়েকটি কথা নিবেদন করতে চাইঃ এক. বাংলাদেশের মুক্তিযদ্ধের চেতনা বলতে সে সব বিষয় ও প্রসঙ্গের সমাধানকে বুঝতে হবে, যে সব বিষয় ও প্রসঙ্গের সমাধান না হওয়ায় একটি নয় মাসব্যাপী রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো। দুই. মুক্তিযুদ্ধের অংশগ্রহণের কারণ, প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতার ফলে শ্রেণী-গোষ্ঠী-ব্যক্তিভেদে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভিন্ন হতে পারে। তিন. কোনো ব্যক্তি-গোষ্ঠী বা দলের গোপন অভিলাষ নয়, বরং তাদের ঘোষিত বক্তব্য-অবস্থানকেই কেবল স্বীকার করা যায়। চার. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করা ও সামাজিক শৃঙ্খলা ও সংহতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত ও বাস্তবায়িত হতে পারে।

www.pathagar.com

বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

মিজানুর রহমান খান*

রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের প্রসঙ্গ আমাদের স্বাধীনতার চেয়ে প্রাচীন। উপমহাদেশ বিভক্তির ইতিহাসের চেয়ে প্রাচীন। এমনকি এই স্বাধীনতার বয়সসীমা ইতোমধ্যে শতাব্দী পেরিয়েছে এবং এখন তা আরেকটি নতুন শতাব্দীকে স্পর্শ করতে চলেছে। ১৯৫৭ সালের ৩৬ নম্বর আইনে ফৌজদারী কার্যধারার পরিবর্তন করে বিচারবিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণে সম্ভবত প্রথমবারের মতো একটি আইন তৈরী হয়। কিন্তু এই আইন বাস্তবে কার্যকর হওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল গেজেটে বড়জোর চার লাইনের একটি প্রজ্ঞাপন। গত ৪১ বছরে, সত্যি বলতে কি, পাকিস্তান গেল, বাংলাদেশ এল কিন্তু সেই প্রজ্ঞাপন আর আলোর মুখ দেখলো না। আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিয়েও সেই আইনের দর্শন পাইনি। ১৯৫৭ সালের ঢাকা ল রিপোর্টে (ডিএলআর) এই আইনটি পাসের শুধু সন-তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু আইনটি ছাপা হয়নি।

১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বরে প্রণীত স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের ২২ অনুচ্ছেদে লেখা হল, "রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।" সার্বিকভাবে পৃথকীকরণের এই যে ধারণা তার মুলে কিন্তু বিচারবিভাগের স্বাধীনতার প্রশ্নটি নিবিড়ভাবে জড়িত। চতুর্থ সংশোধনী পরবর্তী গত ২৩ বছরে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট তথা বিচারবিভাগের মর্যাদা সংবিধানে কতটুকু নিশ্চিত করা হবে বা সেখানে লেখা থাকলেও বাস্তবে নির্বাহী বিভাগ তা কতোটা নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করবেন-সে প্রশ্নে অসাধারণ অস্থিরতা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়েছে। নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান ১৯৯৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারীতে প্রদত্ত ভাষণে উল্লেখ করেন যে, সংবিধান গোড়াতে বিচারবিভাগ সম্বন্ধে যে বিধানাবলী দিয়েছিল গত দুই দশকে তা 'বিংশতিবার' পরিবর্তন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি আমরা লক্ষ্য করি যে, বাংলাদেশের সিভিল সমাজ তথা রাজনীতিকগণ বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও বিচারবিভাগ পৃথকীকরণ ইস্যুতে বরাবরই উচ্চকণ্ঠ থেকেছেন।

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে প্রণীত প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে

---

* সাংবাদিক ও গবেষক।

www.pathagar.com

নির্বাচনী ইশতিহার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াত ও বামফ্রন্ট বিচারবিভাগ পৃথকীকরণে সুনির্দিষ্ট ঘোষণা দিয়েছে। কেবল বিএনপির বর্ণনায় ছিল কিছুটা ভিন্ন সুর। বলা হয়েছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখার সকল ব্যবস্থা নেয়া হবে-অর্থাৎ পৃথকীকরণের কথাটি তারা স্পষ্ট উল্লেখ করেন নি। ষষ্ঠ সংসদের সাধারণ নির্বাচন প্রাক্কালেও তাদের এ সংক্রান্ত ঘোষণা অনুরূপভাবে ছিল দ্ব্যর্থক। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতিহারের আট নম্বর অনুচ্ছেদে নিশ্চিতভাবে বলেছে, 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলনীতি অনুসারে বিচারবিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা হবে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে।

কিন্তু বিচারবিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা যাবে কিভাবে? নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রধান বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন মনে করেন, এই প্রক্রিয়ার তিনটি দিক রয়েছে। প্রথমতঃ প্রশাসনিক, দ্বিতীয়তঃ আইন প্রনয়ন ও তৃতীয়তঃ সংবিধান সংশোধন। কিন্তু বাস্তবে রাজনীতিকরা তাদের কথা ও কাজে এ তিনটি বিষয়কে গুলিয়ে ফেলেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। সংবিধান সংশোধন করতে হলে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন। আর সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিএনপি সরকারের আমলে যেমন বিএনপির ছিল না, তেমনি এখন সেই আওয়ামী লীগের। এর এই না থাকার 'সুযোগ দৃশ্যত উভয়পক্ষ নিয়েছে ও নিচ্ছে বলেই মনে হতে পারে। সম্প্রতি হাইকোর্ট বিভাগ বিচারবিভাগ পৃথকীকরণ প্রশ্নে একটি রায় দিয়েছেন। এ রায়ে বিচারবিভাগ পৃথকীকরণে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন নেই মর্মে অভিমত দেয়া হয়েছে। এ রায়টি অবশ্য এখন আপীল বিভাগে নিষ্পত্তির অপেক্ষায়। হাইকোর্টের অভিমত যে মোকদ্দমাকে ঘিরে এসেছে সেখানে বিচারবিভাগ পৃথকীকরণের প্রশ্ন মুখ্য ছিল না। সুনির্দিষ্ট শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নও ছিল না যে, বিচারবিভাগ পৃথকীকরণে সংবিধান সংশোধন একমাত্র পদ্ধতি অথবা নয়। বিচারকদের তরফে প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ হিসেবে ওই মন্তব্য এসেছে। তবে ওই রায়টি এমন এক সময়ে আসে যখন বিচারবিভাগ পৃথকীকরণ ইস্যুটি বিভিন্ন মহলে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছিল।

১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর পর থেকে অধঃস্তন আদালতসমূহের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণভার সুপ্রীমকোর্টের হাত থেকে সরকারের কাছে চলে যায়। ১৯৭৮ সালে একটি সামরিক ফরমান দিয়ে ওই নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সুপ্রীমকোর্টের সঙ্গে পরামর্শের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এতে সুপ্রীমকোর্ট সন্তুষ্ট হতে পারেনি। লক্ষণীয়, চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাকশাল কায়েমের জন্য সংবিধানের যে সংশোধনীটি নিয়ে এত

www.pathagar.com

বিতর্ক সেই সংশোধনীর 'লিগেছি, কিন্তু আজও আমাদের সংবিধান বহন করছে। ১৯৭৮ সালে ১১৬ অনুচ্ছেদে সংশোধনী আনা হলেও মূল সংবিধানের চরিত্র কিন্তু তাকে আর ফিরিয়ে দেয়া হয়নি। এর কারণ হিসেবে দেখা গেছে, বিচারবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল-নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরীসহ) ও শৃঙ্খলাবিধান সুপ্রীমকোর্টের কর্তৃত্ব মোটেই বজায় থাকেনি। ১৯৭৮ সালের পর থেকে বিচারকদের পদোন্নতি, বদলি ও ছুটি ইত্যাদি বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্তই কার্যকর হতে থাকে। একারণে ওই সময় থেকে সুপ্রীমকোর্ট "ফুলকোর্ট" এর সভায় বিচারকদের পদোন্নতির প্যানেল তৈরীর কাজ পরিত্যাগ করেন। এখানে লক্ষণীয় হচ্ছে, বিচারবিভাগ পৃথকীকরণ ও বিচারবিভাগের স্বাধীনতার প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট মহল সকল সময়ের জন্য উচ্চকিত থাকলেও ১১৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরামর্শের বিধানকে সর্বতোভাবে কার্যকর করার লক্ষ্যে তেমন কোন তৎপরতা লক্ষিত হয় না। খোদ্ সুপ্রীমকোর্ট এখানে শাসনতন্ত্র থেকে বিচ্যুতির শিকার। ১৯৭৫ সালের পর থেকে ১১৬ অনুচ্ছেদের খোল-নলচে বদলাতে বদলাতে এখানে এখন অসঙ্গতি বা একটি সাংঘর্ষিক অবস্থাও বিরাজমান। ১০৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, অধঃস্তন সকল আদালত ও ট্রাইবুন্যালের 'তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের উপর ন্যস্ত। আবার ১১৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, 'বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরীসহ) ও শৃঙ্খলাবিধান চূড়ান্তভাবে কার্যত প্রধানমন্ত্রীর উপর নির্ভরশীল। আবার ১১৬ ক নামের একটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন।" অনেকে যুক্তি দিতে পারেন, সংবিধানে বিচারকদের বিচারকর্যে স্বাধীন থাকতে বলা হলেও একই সঙ্গে এটাও তাদের স্মরণে রাখা হয়েছে যে, তাদের কর্মস্থল নির্ধারণ ও পদোন্নতি রাষ্ট্রের নির্বাহীবিভাগের মর্জির উপর শাসনতন্ত্রই রেখে দিয়েছে। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ ১৯৯৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারীতে প্রধান বিচারপতির পদটি ছেড়ে আসার দিনটিতে আক্ষেপের সুরে বলেছেন, "১১৬ অনুচ্ছেদ যতদিন পর্যন্ত সংশোধিত না হয় এবং বিচারকদের এবং সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও ছুটি সুপ্রীমকোর্টের ওপর না দেয়া হয় ততদিন পর্যন্ত জনগণ বিশ্বাস করবে না যে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা আছে।" তিনি আরো বলেন, "আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও বিদেশিগণ যারা এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থিক লেনদেন এবং কন্ট্রাক্ট-এর মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত, তারা প্রথমেই পরীক্ষা করে

www.pathagar.com

দেখেন এদেশের বিচারবিভাগ সুষ্ঠু এবং স্বাধীন কিনা? সংবিধানের ১১৬ দেখে তারা আমাদের বিচার ব্যবস্থার ওপর আস্থা জ্ঞাপন করতে পারছেন না। ১১৬ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিলে বিচারবিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে এবং বিচার বিভাগ নির্বাহীবিভাগ হতে সঙ্গে সঙ্গে পৃথক হয়ে যাবে। সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ সংশোধন না করে বিচারবিভাগকে স্বাধীন করা এবং বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ out of question." উল্লেখ্য, একসময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ তাদের কোর্টসমূহে মামলা নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান, তাদের পরিচয়, তাদের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রভৃতির ওপর নিয়মিত ত্রৈমাসিক, ও বার্ষিক রিটার্নস সুপ্রমীকোর্টে প্রেরণ করতেন। এর ভিত্তিতে প্রকাশিত হতো `Report on Administration of Criminal Justice' । ২০ বছর ধরে এর প্রকাশনা বন্ধ থেকেছে। প্রসঙ্গক্রমে, বলা যায়, চতুর্থ সংশোধনীর খারাপ প্রভাব কিন্তু আজও বহন করে চলেছে উচ্চ আদালতের বিচারের নিয়োগ সংক্রান্ত ৯৫ অনুচ্ছেদ। সুপ্রীমকোর্টের সঙ্গে পরামর্শের বিধান ১৯৭৫ সালে ছাঁটাই হওয়ার পর আজও তা জোড়া লাগেনি।

আওয়ামী লীগ সরকার বিচারবিভাগ পৃথকীকরণ প্রশ্নে জাতীয় সংসদে বিল আনার লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো একটি অসংসদীয় বিশেষ কমিটি গঠন করে ১৯৯৬ সালের সাত সেপ্টেম্বর। আইন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত এই কমিটি রিপোর্ট পেশ করে ১৯৯৭ সালের ৩০ জানুয়ারী। এ রিপোর্টের সুপারিশমালাকে অনেক বিচারক ও আইনজ্ঞ সুনজরে দেখেননি। যথাযথ প্রতিক্রিয়া দেখানো হয় সুপ্রীমকোর্টের পক্ষ থেকেও। বিচারবিভাগ পৃথকীকরণ প্রশ্নে এই রিপোর্টে যে সব সুপারিশ পেশ করা হয় তা আসলে এক ব্যাপকমাত্রার সাংবিধানিক সংস্কার। সংবিধানের ৯৫, ৯৬, ৯৮, ৯৯,১০৭, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১৫০ অনুচ্ছেদ এবং চতুর্থ তফসিল সংশোধনের সুপারিশ পেশ করা হয় আইন মন্ত্রণালয়ের ওই রিপোর্টে। তারা সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিলের খসড়াও প্রস্তুত করে। এতে উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগসহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে বর্ণিত বিধানাবলি থেকেও সরে আসার প্রস্তাব করা হয়। এই রিপোর্টে কার্যত এমন প্রস্তাবও রাখা হয় যে, কমিটির প্রস্তাবিত বিল পাস করা সাপেক্ষে সরকার ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংবিধানের ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী কাজ করে যেতে পারবে। আরেকটি গুরুতর দিক হচ্ছে, কমিটি বিচারবিভাগ পৃথকীকরণের পর সুপ্রীমকোর্ট কিভাবে দায়িত্ব পালন করবে সে ব্যাপারে তাদের সামর্থ্য সম্পর্কেও সংশয় প্রকাশ করে। আর সম্ভবত সেই বিবেচনা থেকেই ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সদস্যরা ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত নির্বাহী

www.pathagar.com

বিভাগকে 'একলা চলার' সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। সরকার বিষয়টির উপর মতামত চেয়ে আইন কমিশনে প্রেরণ করে ১৯৯৭ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী। সাবেক প্রধান বিচারপতি এফ. কে. এম. এ মুনীমের নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্যের আইন কমিশন তাদের প্রতিবেদনে এ মর্মে দুঃখ প্রকাশ করে যে, আইন মন্ত্রণালয়ের কমিটি সংবিধানের মোট ১২টি অনুচ্ছেদ সংশোধনের সুপারিশ করেছে। অথচ বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ নিশ্চিত করার সঙ্গে সংবিধানের ৯৯, ১০৭, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১৪, ১৫০ এবং চতুর্থ তফসিল সংশোধনের কোনো যোগসূত্র নেই। এই যুক্তি দিয়ে আইন কমিশন কেবল ৯৫, ৯৬, ৯৮, ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদ প্রসঙ্গে তাদের মতামত দেয়। আর এক্ষেত্রেও কমিশন মন্ত্রণালয়ের কমিটির সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে। কমিশন অনেক ক্ষেত্রেই মতামত দেন চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে যা রহিত বা খর্ব করা হয়েছিল তা মূল শাসনতন্ত্রের আদল পুনরুজ্জীবনে। কমিশন বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন তোলে যে, আইন কমিটি অধঃস্তন আদালতে বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের চাকরি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সুপ্রীমকোর্টকে বঞ্চিত করে কেন তাদের 'পদোন্নতি ও শৃঙ্খলা বিধান সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্বাহী বিভাগের হাতে তুলে দেয়ার সুপারিশ করলেন?

আইন সচিব মোঃ আমিনউল্লাহর নেতৃত্বাধীন কমিটি সংবিধানের ১১টি অনুচ্ছেদ সংশোধনের সুপারিশ করে। এর মধ্যে দুটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু রয়েছে। একঃ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগে, দুইঃ তাঁদের অপসারণে। কমিটি বিচারক নিয়োগে প্রস্তাব দিয়েছে জুডিশিয়াল কমিশন গঠনের। প্রধান বিচারপতিকে কমিশনের চেয়ারম্যান করা হয়েছে। আর বিচারকদের মধ্য থেকে তার প্রতিনিধি একজন। ৫ সদস্যের এই প্রস্তাবিত কমিশনের অন্য তিন সদস্য হলেনঃ আইনমন্ত্রী, এটর্নি জেনারেল ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান। অবশ্য কমিটি আইনমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট পেশের ৭২ ঘন্টা না পেরোতেই প্রথম দফা পরিবর্তন ঘটে বলে জানা যায়। হস্তক্ষেপ করেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি। আইনমন্ত্রী এডভোকেট আবদুল মতিন খসরু কমিটির রিপোর্ট নিয়ে গিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতির কাছে। রাষ্ট্রপতি নাকি দেখামাত্রই বললেন, জুডিশিয়াল কমিশনের কাঠামোতে সংশোধনী আনতে। তাই করা হল। এখন বাদ দেয়া হয়েছে, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানকে। প্রধান বিচারপতি এখন দুজন বিচারককে মনোনয়ন দেবেন প্রস্তাবিত কমিশনে। সংশ্লিষ্ট মহল থেকে এমন দাবি করা হয়েছে যে, সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের খোলনলচে বদলে জুডিশিয়াল কমিশন গঠনের প্রস্তাব আনার পেছনে মুখ্যত কাজ করেছে সাবরডিনেট জুডিশিয়ারির আকাঙক্ষা। উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগে কেবলই সুপ্রীমকোর্টের আইনজীবীদের প্রাধান্য দেয়া হয় এটা মানতে পারছিলেন না তারা। তাই

www.pathagar.com

তারা নতুন রাস্তা তৈরী করতে চাইলেন। জুডিশিয়াল কমিশনের মধ্যে ঢোকালেন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের নাম। উদ্দেশ্য, ভবিষ্যতে উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগে জেলা ও দায়রা জজ এবং আইন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রবেশাধিকার সহজ করা। উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগে বিসিএস বিচার এসোসিয়েশনের শতকরা ৫০ ভাগ প্রতিনিধিত্ব চাইছিলেন। বাংলাদেশে গত ২৫ বছরের ইতিহাসে অবশ্য নিম্ন আদালত থেকে আসা বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রতিনিধিত্ব অপ্রতুল। তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন কৃতিত্বে উজ্জ্বল সাক্ষর রেখেছেনও। কিন্তু সুপ্রীমকোর্টের সংশ্লিষ্ট মহল তাকে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করতে চান। তাদের যুক্তিঃ উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগ একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। নিম্ন আদালত থেকে কোটা করে ইমপোর্ট করতে হবে এটা সংবিধানের স্বীকৃত বিচারবিভাগের স্বাধীনতার পরিপন্থী। বিশ্বের কোথাও এই 'কোটা' বা কোটারীকে প্রশ্রয় দেয়া হয়নি। ভারত ও পাকিস্তানেও নয়। সেখানে নিম্ন আদালত থেকে বিচারপতি হচ্ছেন যে না, তা নয়। কিন্তু কোন চাপের মুখে নয়। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের লোক বসিয়ে তা নিশ্চিত করার কথা কেউ ভাবেনি। ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব আহমেদীও একদা মুন্সেফ ছিলেন। এমন কি সেখানে একজন মহিলা মুসলমান জজ অধঃস্তন আদালত থেকে সুপ্রীম কোর্টের বিচারাসনে বসার বিরল সুযোগ লাভ করেছেন। বাংলাদেশেও, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ কিন্তু অধঃস্তন আদালত থেকেই সুপ্রীম কোর্টের আঙ্গিনায় পা রেখেছেন। সিএসপি টার্নড এই বিচারপতির আইন সংক্রান্ত কোন ডিগ্রিও ছিল না। বিচারপতি ইব্রাহিমের মতো খ্যাতিমান বিচারকও এসেছিলেন অধঃস্তন আদালত থেকে। আইনবেত্তারা যুক্তি দেন– প্রধান বিচারপতি যদি ১০ জন বিচারক নেয়ার কথা ভাবেন তবে তিনি তাঁদের বাছাই করতে প্রথমেই দৃষ্টি দেবেন সুপ্রীমকোর্ট বার-এর দিকে। সেখানে তিনি যদি না পান তবেই তিনি চোখ রাখতে পারেন অধঃস্তন আদালতের দিকে। মনে রাখতে হবে, এটাকে কখনই প্যারালাল বিবেচনা করা যাবে না। কারণ অধঃস্তন আদালতের বিচার আর উচ্চ আদালতের বিচার ও তার সার্বিক 'এনভায়রনমেন্ট' এক নয়। এজন্য জার্মানীর মতো অনেক দেশে অধঃস্তন আদালত থেকে কাউকে ঢুকতেই দেয়া হয় না উচ্চ আদালতে। অনেকে বলেন, এই যে প্রভেদ তার স্পষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায়-অধস্তন আদালত থেকে আসা বিচারকদের রায়ে। বাংলাদেশের গত ২৫ বছরের 'জাজমেন্টস'-এর পাঁজি-পুঁথি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে-মৌলিক ও সৃজনশীল রায় লিখেছেন সুপ্রীমকোর্ট বার থেকে আসা বিচারকরাই। অধঃস্তন আদালত থেকে আসা বিচারকরা সাধারণত বিভিন্ন 'পাস্ট জাজমেন্টস' অনুসরণ করে রায় লেখেন। অধঃস্তন

www.pathagar.com

আদালতের বিচারকদের যেভাবে 'মাইন্ড সেট' হয়ে যায় তা উচ্চ আদালতে এসে তাঁরা সহজে ভাঙতে পারেন না।

এরশাদ আমলের পর নাকি আর অধঃস্তন আদালত থেকে বিচারক নিয়োগ করা হয়নি। কমিটির রিপোর্টে সংবিধানের ৯৫(২) (খ) অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগীয় পদের ১০ বছরের অভিজ্ঞতার বিদ্যমান শর্তের সঙ্গে ৩ বছরের জেলা জজ হিসেবে অভিজ্ঞতার একটি বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করে।

এ প্রসঙ্গে উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগে জুডিশিয়াল কমিশন গঠনের পেছনের কাহিনী বলা দরকার। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশের সংবিধানে বিচারক নিয়োগে বর্তমানে কিন্তু মোটামুটি অভিন্ন বিধান রয়েছে। প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেবেন। তবে নির্বাহী ক্ষমতার মালিক প্রধানমন্ত্রীর বাঁধনটাতো থাকছেই। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শের বিষয়টি অনুপস্থিত। চতুর্থ সংশোধনীতে ওটি কেড়ে নেয়া হয়। এই প্রেক্ষাপটে কমিশন গঠনের দিকে আইনপ্রণেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সাবেক প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ। ১৯৯২ সালের ১৪ মার্চ তিনি বললেন, Mr. Anthony lester Q.C. নামক একজন ইংলিশ ব্যারিস্টারের সঙ্গে আলোচনাক্রমে তার মনে হয়েছে জুডিশিয়াল কমিশন গঠনপূর্বক বিচারক নিয়োগ পদ্ধতি যুক্তিযুক্ত (বিস্তারিত দেখুন, সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক, মিজানুর রহমান খান (পৃঃ-৭১-১০৩) পরে তিনি এক সাক্ষাতকারে ৭ সদস্যের কমিশন গঠনের একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেন। এতে তিনি আইনমন্ত্রী, এটর্নি জেনারেল ও সুপ্রীম কোর্ট বার-এর সভাপতির অন্তর্ভুক্তির কথা বলেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের ওই অভিমত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা খুব অনুকূল নয়। যেমন সাবেক প্রধান বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন মনে করেন, কোনভাবেই আইনমন্ত্রীর অন্তর্ভুক্তি মেনে নেয়া যায় না। আর অন্যান্য অনেক বিশেষজ্ঞও আইনমন্ত্রীর অন্তর্ভুক্তির বিরোধী। তাঁরা অবশ্য এটর্নি জেনারেলকেও ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতিনিধি হিসেবেই দেখেন। সুপ্রীমকোর্ট বার সভাপতিও-শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক 'লিগেছি'র উর্ধ্বে যেতে পারবেন না বলে অনেকের ধারণা। তাই সুপ্রীমকোর্টের বিভিন্ন মহল বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় বিচারক নিয়োগ নিয়ে ৭২ এর সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের পুনরুজ্জীবন চান। ১৯৯৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী বিচারবিভাগ পৃথকীকরণ সংক্রান্ত পঞ্চম জাতীয় সংসদে পেশকৃত বাছাই কমিটির রিপোর্টে আওয়ামী লীগ এ ক্ষেত্রে মূল শাসনতন্ত্রের ৯৫ অনুচ্ছেদের পুনরুজ্জীবন চেয়েছিল। বিএনপির অবস্থানও ছিল প্রায় অভিন্ন।

www.pathagar.com

জুডিশিয়াল কমিশন গঠনের ধারণা এ উপমহাদেশে নতুন। নেপাল সহ কয়েকটি কমনওয়েলথ দেশে এ ব্যবস্থা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সংবিধানে ফেডারেল সুপ্রীমকোর্টের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে সিনেটের সম্মতির বিধান রাখা হয়েছে। অর্থাৎ প্রেসিডেন্টের কর্তৃপক্ষের উপর আইন বিভাগ তথা কংগ্রেসের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়েছে। ফ্রান্সসহ কতিপয় রাষ্ট্রে বিশেষ কমিশন/কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী বিচারক পদে নিয়োগদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রধান বিচারপতির সঙ্গে .CONSULTATION-এর সনাতনী নিয়ম নিয়ে কিন্তু বিস্তর বিতর্ক ও সময়ে সময়ে সুপ্রীমকোর্টের হস্তক্ষেপ এ উপমহাদেশে ঘটছে। ভারত ও পাকিস্তান সুপ্রীমকোর্ট এটা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে যে, বিচারক নিয়োগে প্রধান বিচারপতির পরামর্শের অমান্য করা যাবে না। অতি সম্প্রতি ভারতের সুপ্রীমকোর্ট বিচারক নিয়োগে প্রধান বিচারপতিকে তার সহকর্মীদের কাছ থেকে মতামত নেয়ার ব্যাপারে একটি গাইড লাইন বেঁধে দিয়েছে।

উচ্চ আদালতের বিচারকদের অপসারণে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের বিধানটি বাংলাদেশ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ১৯৭৮ সালে। জিয়াউর রহমানের সামরিক ফরমান বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বিধানটি 'ইমপোর্ট' করে পাকিস্তানের সংবিধান থেকে। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে বিচারকদের অপসারণে ইমপিচমেন্ট' বা অভিশংসন প্রথা ছিল। এই অভিশংসনের জন্য দরকার হয় জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এই বিধানটি বাতিল করা হয়। বিচারকদের অপসারণের বিষয়টি কার্যত নির্বাহী প্রধানের একক কর্তৃত্বে নেয়া হয়। সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের ২ দফা পরিবর্তন করে বলা হয়, "অসদাচরণ বা অসামর্থের কারণে রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা কোন বিচারককে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করা যাবে। লোকসভায় বিচারক ইমপিচমেন্টের বিধান অবশ্য ভারতীয় সংবিধানে রয়েছে। ১৯৫৬ সালে প্রণীত পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে কিন্তু বিচারক অপসারণে এই অভিশংসনের বিধান সংযোজিত হয়। তবে এই প্রথা নিয়ে বিতর্ক গোড়া থেকেই ছিল। স্যার আইভর জেনিংস, যিনি পাকিস্তানের সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা তিনি এ বিষয়ে অনেক তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন তাঁর গ্রন্থে। বিচারক অপসারণে রাজনীতিকদের ক্ষমতায়নের বিপক্ষের যুক্তি দিতে রাজনীতিকদের যোগ্যতা ও প্রজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। বলা হয় যে, পাকিস্তানের রাজনৈতিক বাস্তবতায় বিচারকদের অপসারণের বিষয়টি রাজনীতিকদের হাতে থাকলে কোন সময় তাঁরা তার ভুল প্রয়োগ করতে পারেন। এবং পরবর্তীকালে এই ধারণারই জয় হয়। পাকিস্তান ১৯৬২ সালে গ্রহণ করে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের বিধান। এই কাউন্সিল প্রধান

www.pathagar.com

বিচারপতি ও পরবর্তী দুজন কর্মে প্রবীণ বিচারক নিয়ে গঠিত। পাকিস্তানে সংবিধানের খোল-নলচে বহুবার বদলানো হলেও, এটি এখনও অটুট। বাংলাদেশেও সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল প্রবর্তনের পর সুপ্রীম কোর্ট ও আইনজীবীগণ তাকে মেনে নেন। গত দুই দশক এই কাউন্সিল প্রথার বিলোপের দাবি সংশ্লিষ্ট মহল তুলেছেন বলে জানা যায় না। বিচারপতি মোস্তাফা কামাল এই বিধানকে 'more sophisticated' হিসেবে গণ্য করেছেন। পঞ্চম সংসদে সালাহউদ্দিন ইউসুফ (স্বাস্থ্যমন্ত্রী) বিচারবিভাগ পৃথকীকরণ সংক্রান্ত সংবিধানের যে সংশোধনী বিল এনেছিলেন তাতেও এই কাউন্সিলের পরিবর্তন চাওয়া হয়নি। বাংলাদেশের সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল এ যাবৎ কোন বিচারকের 'কন্ডাকট' নিয়ে তদন্ত করেছেন বলে তথ্য নেই। এমনকি এ কাউন্সিলের বৈঠক অনুষ্ঠান সম্পর্কেও জানা যায় না। তবে ১৯৭৮ সালে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠিত হলে, সংবিধানে বর্ণিত তার কার্যপরিধির আওতায় উচ্চ আদালতের বিচারকদের জন্য একটি 'কোড অব কন্ডাকট' প্রণীত হয়। পাকিস্তানের সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল এযাবৎ একজন মাত্র বিচারককে অপসারণ করেছে বলে জানা যায়। সে ঘটনারও সূত্রপাত অবশ্য অবিভক্ত পাকিস্তানে। ঢাকা হাইকোর্টের বিচারক শওকত আলী অপসারিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর জন্য হাফ ডজন মার্সিডিজ গাড়ি আমদানি ও একটি সিগারেট কোম্পানীর সঙ্গে মালিকানা সূত্রে জড়িত ছিলেন। নওয়াজ শরীফের বর্তমান শাসনামলে একজন প্রধান বিচারপতিকে তার পদ থেকে সরে দাড়াতে যেভাবে বাধ্য করা হয় তা অবশ্য একটি বড় মাপের ব্যতিক্রম ও নজিরবিহীন ঘটনা।

আইন সচিবের নেতৃত্বাধীন কমিটি সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের পরিবর্তে অভিশংসনের যে পদ্ধতি সুপারিশ করেছেন তাতে রাজনৈতিক সন্দেহ বেড়েছে। এই সুপারিশটি সম্পর্কেও সুপ্রীমকোর্টের অন্দরমহলের মনোভাব নেতিবাচক। কারণ বাংলাদেশের কোন পার্টি কোনো পরিস্থিতিতে 'টু-থার্ড মেজরিটি'র অধিকারী হলে সংবিধানের গতি কি হবে তা বলা মুশকিল। বাংলাদেশ গত ২৫ বছরে চার দফায় টু-থার্ডের কেরামতি লক্ষ্য করেছে। প্রথম দফায় আনা হয়েছে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী। এটি এক সংসদীয় অভ্যুত্থান। দ্বিতীয় দফায় 'টু-থার্ড' ব্যবহার করে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী আনা হয়। এসময়েও অনেক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। তৃতীয় দফায় জেনারেল এরশাদ হাতে পান 'টু-থার্ড'-এর ক্ষমতা। তিনি 'রাজনৈতিক স্বার্থে' রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম কায়েম করেন। আর ব্যারিস্টার মওদুদের তথ্য সত্য হলে, একজন জেনারেলের বউ-এর তালাক মামলার জের হিসেবে এরশাদ সুপ্রীমকোর্টকে কয়েক টুকরো (সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী, পরে যার একাংশ অবৈধ বলে ঘোষিত) করেন।

www.pathagar.com

আর সবশেষে, ষষ্ঠ সংসদের মাধ্যমে খালেদা জিয়ার হাতে আসে 'টু-থার্ড মেজরিটি'। এবং অতঃপর তিনি সাংবিধানিক আইনের ইতিহাসে একটি অদ্ভূত কনসেপ্ট 'কেয়ারটেকার মডেল' সংবিধানের দেহে স্থাপন করেন। এটা লক্ষণীয় যে, যখনই কোন একক দলের হাতে টু-থার্ড-এর ক্ষমতা এসেছে তখনই সে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন করেছে। আর সম্ভবত সে কারণেই এদেশের সংবিধান বিশারদরা বিচারক অপসারণে অভিশংসনে প্রত্যাবর্তনকে কখনও স্বাগত জানাননি।

আইন সচিব কমিটির তরফ থেকেও অবশ্য তাত্ত্বিক যুক্তি দেয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, বিচারকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিচারকরাই কেন করবেন। এটা তো ক্ষমতার বন্টন তত্ত্বের পরিপন্থী। সংবিধানের বর্তমান বিধান অনুযায়ী, সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল একটি প্যারালাল এপিলেট ডিভিশনের মতো আপনা-আপনি গঠিত হয়ে আছে। কোন বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠামাত্রই এই কাউন্সিল কিন্তু কাজ শুরু করতে পারেন না। ৪৮ অনুচ্ছেদের বাঁধন মেনে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে কোন আবেদন কাউন্সিলের কাছে প্রেরণের পরই কেবল তারা কাজ শুরু করবেন এবং তাঁরা সেক্ষেত্রে স্বাধীন। বিচারপতি এটি মনোয়ার উদ্দিন কর্তৃক সংসদ বর্জন মামলায় বিরোধীদলে আকাঙক্ষার পরিপন্থী রায় দান পরবর্তী রাজনীতিকদের প্রজ্ঞার কথা এ প্রসংগে অনেকেই স্মরণে আনছেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে অভিযোগ আনা হয়। এবং সে ইস্যুতে তৎকালীন সুপ্রীমকোর্ট বার এসোসিয়েশনও রাজনৈতিক বিবেচনায় সোচ্চার হয় বলে মনে করা হয়।

তবে আইন মন্ত্রণালয়ের উক্ত শাসনতন্ত্র সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাব কিন্তু হিমাগারেই রয়ে গেছে। যেমনটা ১৯৯৬ সালে থেকেছে সালাউদ্দিন ইউসুফ কর্তৃক আনীত বিলটি। ওই বিলে সংবিধানের ৯৫, ৯৮, ১০৯, ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদ সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়। ওই বিলের ওপর সর্বদলীয় সংসদীয় বাছাই কমিটি গঠিত হয় ১৯৯১ সালের ১ আগস্ট। ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারীতে বাছাই কমিটি অনৈক্য ও খণ্ডিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি রিপোর্ট সংসদে পেশ করার আগে মোট ১৩টি বৈঠকে মিলিত হয়।

সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরুর আগেই আবদুল মতিন খসরু বলেছেন, স্বাধীন বিচার বিভাগ সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধন বিলে বিরোধীদল বিএনপি যদি সমর্থন নাও দেয় তবে আমরা ম্যাজিস্ট্রেসিকে পৃথক করতে এককভাবে বিল আনবো। পরবর্তীকালে বলেছেন, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসি বিলের খসড়া তৈরী হচ্ছে। শিগগিরই পেশ করা হবে সংসদে। লক্ষণীয়, সপ্তম সংসদে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ

www.pathagar.com

প্রশ্নে রাজনেতিক দলগুলো এখনও কোন আলোচনায় অংশ নেয়নি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সিআরপিসি বা ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধন করে ম্যাজিস্ট্রেটদের চাকরি অনতিবিলম্বে রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গ থেকে পরোক্ষভাবে হলেও সুপ্রীমকোর্টের এখতিয়ারে আনা সম্ভব। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ও অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেসিকে সংস্থাপন ও কেবিনেট বিভাগের অধীন থেকে জেলা ও দায়রা জজদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনা গেলে কিছুটা হলেও পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে। আর এটির খসড়া বিল তৈরী হয়ে আছে। লালফিতার বাঁধনটা খুলে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সংসদে পাস করে নিলেই হলো।

১৮৯৮ সালের সিআরপিসি সংশোধনের মাধ্যমে বিচার বিভাগকে রাষ্ট্রের নির্বাহী থেকে পৃথক করতে পাকিস্তান ১৯৭৩ সালে ও ভারত ১৯৭৪ সালে আইন পাস করে।

সর্বশেষ, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এম মোজাম্মেল হক এবং বিচারপতি হাসান আমিনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ ৭ মে, ১৯৯৭ এক রায়ে বলেন, সুপ্রীম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংবিধানের ১০৯, ১১৫, ১১৬, ১১৬ ক ধারার অনুসরণে ও সংবিধানের ৮ ও ২২ অনুচ্ছেদের আলোকে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা যায়। এজন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হয় না। অধঃস্তন আদালতের বিচারকদের মর্যাদা সংশ্লিষ্ট দায়েকরত রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারকরা তাদের রায়ে সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্বতন্ত্র বেতন স্কেল নির্ধারণের অতিসত্বর একটি রুল জারিরও নির্দেশ দেয়া হয়। সরকার পক্ষ এ রায়ের বিরুদ্ধে অবশ্য আপীল করেছেন। এখন আভাস দেয়া হচ্ছে এই আপীল হলে সরকার পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে।

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের এ ইতিহাস নিশ্চিয়ই এক পরিহাস। ১৯৪৭ সালের পর বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ প্রশ্নে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষাধর্মী প্রয়াস পশ্চিম পাকিস্তানে করা হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান বঞ্চিত থেকেছে। যুক্তফ্রন্টের সেই বিখ্যাত ২১ দফার ১৫ নম্বর দফায় বিচার বিভাগকে শাসনবিভাগ থেকে পৃথকীকরণের ঘোষণা ছিল। এরপর ১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে সিআরপিসি সংশোধনের আইন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। ১৯৫৮ সালে গঠিত আইন কমিশন বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের সরাসরি হাইকোর্ট বিভাগের অধীনে আনার সুপারিশ করে। ১৯৬৭-৭০ সালের আইন কমিশন লক্ষ্য করেন যে, বিচার বিলম্বিত হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে অপৃথকীকরণের জটিলতা। কমিশন ৫৭ সালের মডেলে আইন পাসের সুপারিশ রেখেছিল। ১৯৭৬ সালে বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেনের নেতৃত্বাধীন আইন কমিশনও এ আইনটি কার্যকর করার কথা স্মরণ করেন। ১৯৮৭ সালে

www.pathagar.com

পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয়তায় গুরুত্বারোপ করে সিআরপিসি সংশোধনের একটি বিল সংসদে উপস্থাপিত হয়। ১৯৮৭-র ১ এপ্রিল থেকে এই বিল কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আজও তা শুধুই একটি কাগুজে দলিল।

রাষ্ট্রচিন্তা'র সৎ উদ্যোগ সফল হোক।
আগামী শতাব্দীর মানস গঠনে
তাদের মননশীল ভূমিকা যেন
অব্যাহত থাকে।

নিউ ভিশন

প্রচারণী, বিজ্ঞাপনী ও নকশা কেন্দ্র

সাত্তার ম্যানসন, ১ সিডিএ বা/এ, মোমিন রোড,
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ফোন ঃ ৮৮০-৩১-৬১৩০৫১

www.pathagar.com

অর্থনীতির কয়েকটি ইস্যু ও সাহায্যদাতাদের পরামর্শ

মাসুমুর রহমান খলিলী*

বাংলাদেশ বিশ্বের স্বল্পোন্নত ৪৮টি দেশের মধ্যে অন্যতম। এদেশের স্বল্প বিকশিত অর্থনীতি নানা সংকটের মুখোমুখি। এসব সংকট কোন সময় মারাত্মক হিসেবে প্রতিভাত হয়, আবার কোন সময় মনে হয় এসব সমস্যা উন্নয়নশীল দেশের জন্য স্বাভাবিক। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কতিপয় ইস্যু গুরুত্বপূর্ণ সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে। এসব ইস্যুর প্রতি সরকারের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি যেমন আছে তেমনিভাবে সাহায্যদাতা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি এক্ষেত্রে নানা ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের অর্থনীতির বিকাশ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার ৫০ ভাগের বেশী[১] এখনো সাহায্যদাতা দেশ ও সংস্থার উপর নির্ভরশীল। তাই ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায়- সাহায্যদাতা দেশসমূহের পরামর্শ বাংলাদেশকে অনুসরণ করতে হয়। এসব পরামর্শের অনেকগুলো বাংলাদেশ-অর্থনীতির জন্য আবশ্যকীয় বলে যেমন প্রমাণিত হয় তেমনিভাবে অনেক শর্ত দেশ ও জনগণের স্বার্থ পরিপন্থী বলেও প্রতীয়মান হয়। এসব পরামর্শ মূলতঃ সাহায্যদাতা দেশ ও সংস্থার স্বার্থকে পূরণ করে। সংক্ষিপ্ত পরিসরের এই নিবন্ধে বাংলাদেশের সমষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন ইস্যু এবং এক্ষেত্রে সাহায্যদাতা গোষ্ঠীর পরামর্শ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের মতে বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু সমষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্য ৪টি পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্য রাজস্ব বৃদ্ধি করতে হবে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আকার বাস্তবভিত্তিক রাখতে হবে, ঋণ লাভের সুযোগ ব্যাহত না করে মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য আর্থিক নীতি কঠোর করতে হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা নমনীয় করতে হবে।[২]

রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একদিকে প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণ করা হয় অন্যদিকে ব্যয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। বাংলাদেশে সরকারী আয়ের প্রধান উৎস হল কর রাজস্ব। কর রাজস্ব থেকে সরকারের ৮০ ভাগ আয় হয়। অবশিষ্ট ২০ ভাগ আসে কর বহির্ভূত খাত থেকে।[৩] আবার কর রাজস্বের সিংহ ভাগ আসে পরোক্ষ কর

---

* দৈনিক দিনকালের বিশেষ সংবাদদাতা।

www.pathagar.com

থেকে। বিগত ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে মোট কর রাজস্বের মাত্র ১৪ শতাংশ এসেছে প্রত্যক্ষ কর থেকে।[৪] প্রতি বছরই দেখা যায় মোট কর রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের অবদান কমে যাচ্ছে। ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরেও কর রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের অবদান ছিল ১৭ শতাংশের চেয়ে বেশী। পরবর্তী বছরগুলোতে কর রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের অনুপাত আরো হ্রাস পায় । আমদানি পণ্য থেকে বাংলাদেশে সর্বাধিক রাজস্ব আহরিত হয়। বিগত অর্থ বছরে আমদানি পর্যায়ে বহিঃ শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক থেকে মোট কর রাজস্বের প্রায় ৫৯ শতাংশ রাজস্ব আদায় হয়। বাকি ৪১ শতাংশের মধ্যে ১৪ শতাংশ আয়কর এবং ২৭ শতাংশ আসে স্থানীয় পর্যায়ের মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শূল্ক, আবগারী কর ও বিবিধ খাত থেকে। রাজস্ব আদায়ের এ ধারা '৯০ এর দশক থেকে চলে এসেছে। এর আগে কর রাজস্বে আমদানি শুল্কের অবদান তুলনামূলকভাবে বেশী ছিল।' ৯০ এর দশকের প্রারম্ভিককালে বাণিজ্য উদারীকরণ নীতি গ্রহণ করার পর হতে দ্রুত আমদানি শুল্ক হার কমিয়ে আনা হয়। গ্যাট চুক্তি অনুসারে ২০০৫ সাল নাগাদ সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ককে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার উদ্যোগের অংশ হিসেবে প্রতিবছরই সর্বোচ্চ শুল্ক হার কমানো হয়। ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে যেখানে সর্বোচ্চ শুল্ক হার ১০০ ভাগ ছিল তা ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ৪০ ভাগ নামিয়ে আনা হয়। দ্রুত আমদানি শুল্ক হ্রাসের কাজটা প্রধানত করা হয় ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে। পরবর্তী বছরগুলোতে শুল্ক হার কমানো হয় তবে কমানোর হার ছিল তুলনামূলকভাবে কম। শুল্ক হার হ্রাস করার কারণে উল্লিখিত সময়ে পণ্য আমদানি যত বেড়েছে আমদানি পর্যায় থেকে রাজস্ব আদায় সেভাবে বাড়েনি। অধিকন্তু মোট কর রাজস্বে আমদানি খাতের সামগ্রিক অবদান হ্রাস পেয়েছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রত্যক্ষ কর ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। প্রত্যক্ষ কর কমা মানে হলো অর্থনৈতিক অসমতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়া।[৫] কারণ পরোক্ষ কর উৎপাদক বা আমদানিকারক যার উপর আরোপ করা হোক না কেন শেষ পর্যন্ত করের বোঝা বহন করতে হয় ভোক্তাকে। অপর দিকে প্রত্যক্ষ করদাতা এই কর আর কারো উপর চাপিয়ে দেয়ার সুযোগ পায়না। প্রত্যক্ষ কর ও আমদানি পর্যায়ের রাজস্ব আদায় হ্রাস পাওয়ায় স্থানীয় খাতের উপর করের চাপ ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা চালু করার প্রথম বছর স্থানীয় পর্যায়ের আবগারী শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক থেকে আদায়কৃত রাজস্ব ছিল মোট কর রাজস্বের ২৫ শতাংশের মত। ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে স্থানীয় খাত থেকে আদায়কৃত রাজস্ব দাঁড়ায় মোট কর রাজস্বের ৩৬ শতাংশে। এর পরের বছর অবশ্য স্থানীয় খাত

www.pathagar.com

থেকে রাজস্ব আদায় কমে যায়। সর্বশেষ ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে স্থানীয় পর্যায়ের শুল্ক আবার কিছুটা বেড়ে ২৭ শতাংশে উন্নীত হয়। স্থানীয় খাতগুলোর মধ্যে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কখাতে রাজস্ব আদায় ক্রমাগত বেড়েছে। মূল্য সংযোজন করকে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে বিস্তৃত করার মাধ্যমে রাজস্ব বাড়ানো হয়েছে। এর প্রভাব ভোক্তাদের উপর যেমন পড়ছে তেমনিভাবে পড়ছে স্থানীয় শিল্পের উপরও। স্থানীয় শিল্পের উপর করের চাপ বৃদ্ধি এবং আমদানি পণ্যের উপর শুল্ক কমানো হলে স্থানীয় শিল্পকে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়।

বিশ্বব্যাংক জিডিপির তুলনায় করের হার বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে।[৬] ৮০'র দশকের শেষ দিকে (১৯৮৮ অর্থবছর) বাংলাদেশে রাজস্ব জিডিপি'র অনুপাত ছিল ৮.৯ শতাংশ। ৯০'এর দশকের শুরু থেকে রাজস্ব আয় বাড়তে শুরু করলে রাজস্ব জিডিপির অনুপাতও স্ফীত হয়। ১৯৯৪ অর্থ বছরে তা সর্বোচ্চ ১২.২ শতাংশে উন্নীত হয়।[৭] পরের বছরও অনেকটা এ হার অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৯৬ অর্থ বছর থেকে জিডিপি রাজস্ব অনুপাত কমতে শুরু করে। ১৯৯৮ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় জিডিপি'র অনুপাত ৯.১ শতাংশে নেমে আসে।[৮] কর রাজস্ব জিডিপি'র অনুপাতের চিত্রও ছিল অনুরুপ। ১৯৯৬ অর্থবছরে কর রাজস্ব আদায় হয়েছিল জিডিপি'র ৯.৬ শতাংশ। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে তা ৮.৯ শতাংশে নেমে আসে। বিশ্বব্যাংক বলেছে, জিডিপি'র তুলনায় রাজস্ব আদায়ের এ হার বাড়াতে হবে। রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিশ্বব্যাংকের প্রথম পরামর্শ হলো আমদানি শুল্ক কমানো। বিশ্বব্যাংক চায় ২০০০ অর্থবছরের মধ্যে শুল্ক হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে। শুল্ক হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হলেও বিদেশী পণ্যের কথিত বিরাট মজুদের বিরুদ্ধে স্থানীয় শিল্পের জন্য কিছু সংরক্ষণ সুবিধা বহাল থাকবে। রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজন কর ও অন্যান্য কর বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা এড়াতে হবে।[৯]

আগেই বলা হয়েছে প্রত্যক্ষ করের হার বাংলাদেশে ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। এ করকে দ্রুত বাড়ানোর মত সম্ভাবনা খুবই কম। ফলে আমদানি শুল্ক কমানোর পর জিডিপি'র তুলনায় রাজস্ব বাড়ানো তো দূরের কথা অনুপাতকে স্থির রাখতে হলেও অভ্যন্তরীণ খাত সমূহে শুল্ক-কর বাড়াতে হবে। আর মূল্য সংযোজন করকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করা ছাড়া স্থানীয় পর্যায়ের রাজস্ব আদায় বাড়ানোর কোন অবকাশ নেই। স্থানীয় পর্যায়ের খাতগুলোর মধ্যে সম্পূরক কর আদায়ের সুযোগ টোবাকোর মত সীমিত কয়েকটি পণ্যের মধ্যে সীমিত। এ অবস্থায় স্থানীয় পর্যায়ের ভ্যাট ও অন্যান্য কর বৃদ্ধি এড়িয়ে এবং ২০০০

www.pathagar.com

অর্থবছরের মধ্যে শুল্ক হারকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হলে রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এমন সম্ভাবনা একেবারেই নেই। এ কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা যায় শুল্ক হার হ্রাসের পাশাপাশি মূল্য সংযোজন করের ভিত্তিকে স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত করা হয়েছে। এমনকি চলতি অর্থবছরের (১৯৯৮-৯৯) প্রথম ৪ মাসে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৫৭০ কোটি টাকা রাজস্ব ঘাটতির[১০] ফলে ৩০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের জন্য যে সব খাত বেছে নেয়া হয়েছে তার অধিকাংশই হলো স্থানীয় খাত। এর মধ্যে ব্যাংকের সঞ্চয়ের সুদ এবং সঞ্চয়পত্রের মুনাফার উপরও সারচার্জ আরোপ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংক কর আদায় ব্যবস্থাপনায় সংস্কার সাধনের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির যে পরামর্শ দিয়েছে তা কার্যকর করা গেলে সাময়িকভাবে হলেও রাজস্ব আদায়ে কিছুটা চাঙ্গাবস্থা আসার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু আমদানি শুল্ক হার হ্রাস, যা করতে সরকার গ্যাট চুক্তির কারণে বাধ্য, তাতে স্থানীয় শিল্পখাতের উপর মারাত্মক চাপ পড়বে। শিল্পখাতের দুর্বল অবস্থায় এ চাপ মোকাবেলা করে এ খাত কতটুকু টিকে থাকতে পারবে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ ও অন্যান্য দাতা সংস্থার অন্যতম প্রধান পরামর্শ হলো সরকার পরিচালনা ব্যয় তথা রাজস্ব ব্যয় কমানো।[১১] জিডিপির তুলনায় সরকারী ব্যয় (উন্নয়ন ও রাজস্ব) দেশে ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। ১৯৮৭ অর্থবছরে সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল জিডিপি'র ১৭.২৪ শতাংশ। ১৯৯১ অর্থবছরে তা ১৫ শতাংশে নেমে আসে। ১৯৯৬ অর্থবছরে জিডিপি ও সরকারী ব্যয়ের হার দাঁড়ায় ১৬.৮ শতাংশে। ১৯৯৮ অর্থবছরে তা আরো বেড়ে ১৭.৩ শতাংশে উন্নীত হয়। রাজস্ব ব্যয় ১৯৯৩ অর্থবছর পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে আবার কমতে শুরু করে। বিগত অর্থবছরে এসে তা আবার বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৫ অর্থবছরে যেখানে রাজস্ব ব্যয় জিডিপি'র অনুপাত ৮.৮ শতাংশ ছিল ১৯৯৮ অর্থবছরে তা বেড়ে ৯.৪ শতাংশে উন্নীত হয়। উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধির চিত্র কিছুটা ভিন্নরূপ। ১৯৯১ অর্থবছর থেকে উন্নয়ন কর্মসূচীতে ব্যয় ক্রমাগতভাবে বাড়তে বাড়তে ১৯৯৫ অর্থবছরে ৮.৮ শতাংশে উন্নীত হয়। ১৯৯৮ অর্থবছরে তা আবার হ্রাস পেয়ে ৭.৯ শতাংশে নেমে আসে।[১২] বিশ্বব্যাংকের আপত্তি রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির ব্যাপারে যেমন তেমনিভাবে উন্নয়ন ব্যয়ের ক্ষেত্রেও। ব্যাংকের মতে, জনগণের জন্য প্রয়োজন ভাল সরকার। আর ভাল ও কার্যকর সরকার হয় সবসময় ছোট। সরকারকে ছোট ও কার্যকর করার জন্য বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে জন প্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। এ কমিশন প্রশাসনের সংস্কারের জন্য এখনো চূড়ান্ত রিপোর্ট দেয়নি। তবে

www.pathagar.com

বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ অনুসারে সরকারী চাকরীতে নতুন নিয়োগ সীমিত করে আনা হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের জনবলকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও শিল্প কারখানায় গোল্ডেন হ্যান্ডশেক-এর মাধ্যমে জনবল হ্রাসের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কিন্তু বিশ্বব্যাংক সরকারী খাতের চাকরী বা কর্মসংস্থান সীমিত করার ফলে সৃষ্ট কর্মসংস্থান সংকট বেসরকারী খাতের বিকাশের মাধ্যমে সমাধানের যে পরামর্শ দিয়েছিল তা কার্যকর হয়নি। সরকারী খাতকে সংকুচিত করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হলেও বেসরকারী খাতে সেভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। ফলে বেকার ও আধা বেকারের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে দেশের মোট জনসংখ্যার আড়াই শতাংশ ছিল বেকার। এই বেকারের সংখ্যা মোট শ্রমশক্তির (জনসংখ্যার ৪১.৭০ ভাগ) ১২.৩৮ শতাংশ। একই সময়ে আধা বেকারের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ–যারা তাদের যোগ্যতা ও সামর্থ্যের তুলনায় অনেক কম মজুরীতে কর্মরত রয়েছে।[১৩] পুরুষ জনশক্তির মধ্যে আধা বেকারের হার হলো ৭৮ শতাংশ আর মহিলাদের মধ্যে এ সংখ্যা ৫১ শতাংশ। সবচেয়ে উদ্বেগের কারণ হলো দেশের জনসংখ্যার যে বয়স কাঠামো রয়েছে তাতে প্রতিবছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় শ্রম বাজারে নতুন জনশক্তি প্রবেশের হার অধিক। বর্তমানে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৬ শতাংশ হলেও শ্রমবাজারে জনশক্তি প্রবেশের হার ২.৩ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতিবছর ১৩ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে।[১৪] শ্রমশক্তি বৃদ্ধির হারের সাথে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সামঞ্জস্য না থাকলে বেকারত্বের হার যেভাবে বাড়ার কথা বর্তমানে দেশে তাই হচ্ছে। পোশাক শিল্প সহ বেসরকারী খাতে যেসব কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে তার সিংহভাগ ক্ষেত্রে মজুরী দেয়া হয় একেবারেই ন্যূনতম। ফলে বেসরকারী খাত আশানুরুপভাবে কর্মসংস্থান সংকটের সুরাহা করতে পারছেনা। অধিকন্তু কর্মসংস্থানের প্রধানক্ষেত্র শিল্প খাতের বিকাশ আশানুরুপ না হওয়ায় বেসরকারী খাতে নতুন কর্মসংস্থানের পরিমাণগত চিত্রও উৎসাহব্যঞ্জক নয়। এ অবস্থায় বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ অনুসারে সরকারী খাতের অধিকতর সংকোচন বড় ধরনের সামাজিক সংকটেরও সৃষ্টি করতে পারে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ব্যয়ের ব্যাপারে সাহায্যদাতা সংস্থা সমূহের আপত্তি গুণ ও পরিমাণগত উভয় ক্ষেত্রেই। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ অনুযায়ী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ও উদ্দীপক ব্যর্থতা দূর করতে হবে। উন্নয়ন কর্মসূচীতে গৃহীত প্রকল্পের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিশ্বব্যাংক প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছে, এমন অনেক প্রকল্প

www.pathagar.com

রয়েছে যেগুলোতে বাজেটে অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে কিন্তু সংশ্লিষ্ট ফোরামে তা অনুমোদন লাভ করেনি। উচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত অনেক প্রকল্পের যৌক্তিকতা সম্পর্কেও নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত অধিকাংশ প্রকল্পই নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। ফলে প্রকল্প ব্যয় যেমন বেড়ে যায় তেমনিভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের পর যে ফল পাওয়ার কথা তাও অনেকাংশে সংকুচিত হয়ে যায়। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেখা যায় অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বাস্তবায়ন অগ্রগতি থাকে নাম মাত্র। দ্বিতীয় প্রান্তিক শেষে ৮০ শতাংশে অধিক কাজ অবাস্তবায়িত থেকে যায়। তৃতীয় প্রান্তিকে প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থ ছাড়করণের ব্যাপারে তাগিদ শুরু হয় আর শেষ প্রান্তিকে তড়িঘড়ি করে প্রকল্পের অর্থ ব্যয় করা হয়। বছর শেষে প্রকল্প বাস্তবায়নের আর্থিক অগ্রগতি ৯০ শতাংশের উপরে উঠে গেলেও বাস্তব অগ্রগতি হয় একেবারেই কম। অর্থবছরের শেষ দিকে এসে প্রকল্পের খরচ তড়িঘড়ি করে করার ফলে অর্থের অপচয় অনেক বেড়ে যায়। উন্নয়ন প্রকল্প থেকে যে সুফল পাবার কথা বাস্তবে পাওয়া যায় তার সামান্যই। প্রতিবছরই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন পরিস্থিতি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভায় আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়। একই ধরনের সমস্যা সমূহ বার বার চিহ্নিত হয় এবং এসব সমস্যা দূর করার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তাও বছরের পর বছর অভিন্ন থাকে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর ব্যয় বরাদ্দে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে। এডিপি পর্যালোচনায় দেখা যায়, চলতি দশকের প্রারম্ভিক সময়ের তুলনায় সাম্প্রতিক দুই বছরে কৃষি, পানি সম্পদ, শিক্ষা প্রভৃতি খাতে বরাদ্দ হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে পল্লী উন্নয়ন, শক্তি, পরিবহণ, ভৌত পরিকল্পনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি খাতে উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৫] সামাজিক ও দারিদ্র্য বিমোচন খাত সমূহে ব্যয় বরাদ্দ দানে অধিক গুরুত্ব দেয়া শুরু হয় মূলতঃ ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছর থেকে। ১৯৯০-৯১ অর্থবছরের মোট এডিপিতে সামাজিক খাতের অনুপাত যেখানে ১৩ শতাংশ ছিল তা ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে ২৪ শতাংশে উন্নীত হয়।[১৬] এডিপিতে স্থানীয় সম্পদের যোগান দানের ক্ষেত্রে ৮০'র দশকে খুবই মন্দাবস্থা বিরাজ করে। এক পর্যায়ে উন্নয়ন ব্যয়ের শতভাগ নির্বাহ করতে হয় বৈদেশিক সাহায্য থেকে। ৯০ এর দশকের শুরু থেকে অবস্থার ধীরে ধীরে পরিবর্তন শুরু হয়। ১৯৯১ অর্থবছরে ২৪.৯৯ শতাংশ উন্নয়ন ব্যয় স্থানীয় সম্পদ থেকে নির্বাহ করা হয়। ১৯৯৫ অর্থবছরে এডিপিতে স্থানীয় সম্পদের যোগান বেড়ে ৪৩.০৩ শতাংশে উন্নীত হয়। বিগত অর্থবছরে উন্নয়ন কর্মসূচীতে স্থানীয় সম্পদের যোগান ছিল

www.pathagar.com

৪৫.২৫ শতাংশ।[১৭] চলতি দশকের গোড়ার দিকে প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে স্থানীয় সম্পদের যোগান যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাতে অনেকটা স্থবিরতা নেমে এসেছে। এসময়ে জিডিপির তুলনায় এডিপি'র ব্যয় হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় সম্পদের অবদান উন্নয়ন কর্মসূচীতে বৃদ্ধি করা সম্ভব না হওয়ার মূল কারণ হলো রাজস্ব আদায়ে স্থবির অবস্থা সৃষ্টি হওয়া। এ স্থবিরতা দূর করা সম্ভব না হলে উন্নয়ন ব্যয়ে স্থানীয় সম্পদের অবদান বাড়ানো সম্ভব হবে না। আর বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর উন্নয়ন প্রকল্পে দাতা দেশ বা সংস্থার এমন কতগুলো শর্ত সন্নিবেশ করা থাকে যার কারণে বিদেশী পরামর্শকদের পেছনে প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্থ চলে যায়।

বিশ্বব্যাংক ও সাহায্যদাতা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় গৃহীত কিছু কিছু প্রকল্পকে বেসরকারী খাতের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্যও পরামর্শ দেয়া হয়েছে। পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন কর্মসূচী নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ দৃষ্টিভঙ্গীকে সামনে রাখা হয়েছে। বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং টেলিযোগাযোগ খাতে সরকারীভাবে এতদিন যে সব প্রকল্প গ্রহণ করা হত তার অনেকগুলোই বেসরকারী খাতের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। যোগাযোগ খাতে সড়ক অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও বেসরকারী খাতের অংশগ্রহনের সুযোগ সৃষ্টির ভাবনা-চিন্তা করা হচ্ছে। শিক্ষাখাতে বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার দায়িত্বের একটি বড় অংশ এনজিওদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সামগ্রিকভাবে সরকারী উদ্যোগের একটি অংশে বেসরকারী অংশগ্রহণ জোরদার করার দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এই উদ্যোগের বেশ কিছু ইতিবাচক দিক যেমন আছে তেমনিভাবে এতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ, অনুশাসন ও প্রভাব অনেকক্ষেত্রে সংকুচিত হয়ে যাবার আশংকাও রয়েছে।

বিশ্বব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য আর্থিক নীতিকে কঠোর করতে বলেছে। তবে সাথে সাথে উল্লেখ করেছে যে, এমন পদক্ষেপ নেয়া যাবে না যাতে ঋণ লাভের সুযোগ ব্যাহত হয়। একদিকে আর্থিক নীতিকে কঠোর করা অন্য দিকে ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পরামর্শ বাস্তবায়ন করা সরকারের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা থাকলে এবং বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য ইতিবাচক থাকলে স্থানীয় মুদ্রার মান শক্তিশালী থাকে। রফতানি আয় ও রেমিটেন্স প্রাপ্তি হ্রাসের সাথে সাথে আমদানি ব্যয়ের বৃদ্ধি ঘটলে স্থানীয় মুদ্রার উপর চাপ বাড়ে। এ অবস্থা সৃষ্টি হয় সাধারণত দেশে উৎপাদন বিপর্যয় সৃষ্টি হলে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে টাকার অবমূল্যায়ন করার জন্য চাপের সৃষ্টি হয়। আর অবমূল্যায়ন করা হলে তা মূল্য পরিস্থিতির উপর চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপকে কমানোর জন্য সরকার মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের উপকরণ ব্যবহার করে।

www.pathagar.com

সরকার সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ সংকুচিত করে। ঋণ দান কর্মসূচী গুটিয়ে নেয়। এতে ব্যাপক অর্থ সরবরাহও হ্রাস পায়। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে অতিশয় স্বল্পহারে (২.৫২ শতাংশ) মুদ্রাস্ফীতির পর বিগত অর্থবছরে যখন মুদ্রাস্ফীতির চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন সরকার কঠোর মুদ্রা নীতি অনুসরণের নামে অর্থ সরবরাহ কমিয়ে দেয়। এতে ব্যাংকের ঋণ প্রাপ্তিও সংকুচিত হয়ে পড়ে। ট্রেজারী বিল বিক্রির মাধ্যমে সরকার ব্যাংক থেকে টাকা উঠিয়ে নেয়। এ অবস্থায় ব্যবসায়ীদের সমালোচনার মুখে সরকার বিগত অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে ঋণ প্রদানে আবার উদার মনোভাব প্রদর্শন করে। সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ (এম-১) এবং ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২) দুটোই বৃদ্ধি পায়।[১৮] এর প্রভাব পড়ে মুদ্রাস্ফীতির উপর। অর্থবছর শেষে মুদ্রাস্ফীতির হার উঠে ৬.৯৯ শতাংশে।[১৯] চলতি অর্থবছরের প্রারম্ভিক মাস গুলোতেও একই অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। তবে চলতি অর্থবছরের ব্যতিক্রম হচ্ছে এবার অর্থ সরবরাহ সংকোচন ও মুদ্রাস্ফীতির উর্ধ্বগতি দুটোই একই সাথে চলছে। এ অবস্থা অর্থনীতির জন্য যেমন বিপজ্জনক তেমনিভাবে সাধারণ মানুষের দুর্দশাকেও তা চরমে পৌঁছায়। অর্থমন্ত্রী অবশ্য এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য বন্যাকে দায়ী করে ১৯৯৯ সালের জানুয়ারী থেকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আগের চাইতেও বেশী গতিশীল করতে পারবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।[২০]

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ বরাবরই বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের ক্ষেত্রে নমনীয় নীতি অনুসরণের পরামর্শ দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকও বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ নীতি অনুসরণ করে থাকে। এ নীতির অংশ হিসেবে ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশী টাকার সাতবার অবমূল্যায়ন করা হয়। জুন '৯৭ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মধ্যমান দাঁড়ায় ৪৩.৬৫। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরেও টাকার ৫ বার অবমূল্যায়ন করে টাকা-ডলার বিনিময় হার পুনঃনির্ধারণ করা হয়। এতে প্রতি ডলারের সমান দাঁড়ায় ৪৬.৩০ টাকা (মধ্যমান)।[২১] চলতি অর্থবছর শুরু হবার পর দুই দফায় প্রায় ৫ শতাংশ অবমূল্যায়ন করার পর সর্বশেষ ডলারের বিনিময় হার দাঁড়ায় ৪৮.৬৫ টাকা।[২২] সাধারণত বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত বাস্কেট অনুযায়ী টাকার প্রকৃত বিনিময় হার (আর ইইআর) বের করে টাকার মূল্যমান নির্ধারণ করে। সর্বশেষ অবমূল্যায়নের সময় এর পরিবর্তে আইএমএফ-এর পরামর্শকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। বাংলাদেশী মুদ্রাকে এখনো পূর্ণ রূপান্তরযোগ্য করা হয়নি। পর্যায়ক্রমে টাকাকে পূর্ণ রূপান্তরযোগ্য করার চিন্তা ভাবনা থাকলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মুদ্রা বিপর্যয়ের পর নীতিনির্ধারকরা এখন আর টাকাকে পূর্ণ রূপান্তরযোগ্য করার চিন্তা করছেন না।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে প্রতিবারই টাকার অবমূল্যায়নের সময় আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় রফতানিযোগ্য পণ্যের প্রতিযোগিতা বজায় রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় আমদানি নিরুৎসাহিত করণের লক্ষ্যে টাকার বহির্মূল্য সংহত করার কথা বলা হয়।[২৩] কিন্তু টাকার অবমূল্যায়নের কারণে অর্থনীতিতে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে তা কোন সময় উল্লেখ করা হয়না। টাকার অবমূল্যায়নের জন্য প্রধানত দাবী উত্থাপিত হয় তৈরী পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) পক্ষ থেকে। কিন্তু অনেক অর্থনীতিবিদ (অধ্যাপক আবু আহমদ, ডঃ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য প্রমুখ) মনে করেন টাকার অবমূল্যায়নে পোশাক রফতানিকারকদের শেষ পর্যন্ত কোন লাভ হয়না। রফতানিকৃত পোশাকের ৮০ ভাগ উপকরণ আমদানি করতে হয় বলে রফতানি পণ্যে যে বাড়তি দাম পাওয়া যায় তা পণ্য আমদানিতে শেষ হয়ে যায়। আর আমদানিকে নিরুৎসাহিত করার জন্য টাকার অবমূল্যায়নে তাৎক্ষণিক কিছু ফল পাওয়া গেলেও এর দীর্ঘ মেয়াদী প্রতিক্রিয়া অর্থনীতিতে অনুকূল হয় না। বাংলাদেশে উৎপাদিত অধিকাংশ শিল্পপণ্য আমদানিকৃত কাঁচামাল নির্ভর। টাকার অবমূল্যায়নে এসব শিল্পের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। ফলে তাদের উৎপাদিত পণ্যের দাম বাড়াতে হয়। আমদানিকৃত পণ্যের দাম অবমূল্যায়নের সাথে সাথেই বেড়ে যায়। কিছুটা দেরীতে বাড়ে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের দাম। এতে মূল্য পরিস্থিতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। টাকার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে আবার অবমূল্যায়নের জন্য চাপ বাড়তে থাকে। একই সাথে স্থির আয়ের জনগণের ক্রয়ক্ষমতাও কমে যায়। এর প্রভাব পড়ে বাজারে। বাজারে জিনিস পত্রের চাহিদা কমলে এর প্রভাব শিল্পায়ন ও বিনিয়োগের উপরও পড়ে। এভাবে অর্থনীতি একটি দুষ্টচক্রে আটকে যায়। দীর্ঘদিন এভাবে চলতে থাকলে অর্থনীতি একটি সামগ্রিক মন্দা পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যায়। এর প্রভাবে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতাও দেখা দেয়। সাহায্যদাতা সংস্থাগুলোর পরামর্শে এসব দিক সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় না। এমনকি কোন কোন সময় এমন পরস্পর বিরোধী পরামর্শও দেয়া হয় যাতে ব্যাপারটা ঠিক যেন এমন দাঁড়ায়, "বেশী বেশী কোরমা-পোলাও খেতে হবে কিন্তু বপু স্ফীত করা যাবে না।"

তথ্যসূত্র ঃ

১। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১৯৯৮, অর্থমন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, জুন ১৯৯৮।

২। Bangladesh : An Agenda for Action, The World Bank, June 1996.

৩। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সংকট ঃ বাংলাদেশের উন্নয়ন পর্যালোচনা ১৯৯৭, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ, জুলাই, ১৯৯৮।

৪। Economic Trends, September, 1998, Bangladesh Bank.

www.pathagar.com

৫। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সংকট, বাংলাদেশের উন্নয়ন পর্যালোচনা, ১৯৯৭, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, জুলাই, ১৯৯৮।
৬। Bangladesh: Annual Economic Update 1997, Economic Performance, Policy Issues and priority Reforms,World Bank, October, 1997.
৭। Economic Trends, September, 1998, Bangladesh Bank.
৮। Economic Trends, September, 1998, Bangladesh Bank.
৯। বাংলাদেশ ঃ যে কাজ করতে হবে, বিশ্বব্যাংক, জুন ১৯৯৬।
১০। সাময়িক রাজস্ব আদায় পরিসংখ্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, নভেম্বর ১৯৯৮।
১১। উন্নয়নে যৌথ প্রয়াস ঃ বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা, বিশ্বব্যাংক, মার্চ ১৯৮৮।
১২। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১৯৯৮, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, জুন ১৯৯৮।
১৩। The Dancing Horizon : Human Development Prospect for Bangladesh, World Bank, UNESCO, UNDP, IMF, ILO, FAO, ADB & other UN Organisation, Dhaka, Bangladesh, 1997.
১৪। The Dancing Horizon, Human Development Prospect for Bangladesh, World Bank, UNESCO, UNDP, IMF, ILO, FAO, ADB & other UN Organisation, Dhaka, Bangladesh, 1997.
১৫। The Fifth Five Year Plan 1997-2002. Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh, March, 1998.
১৬। The Fifth Five Year Plan 1997-2002. Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh, March, 1998.
১৭। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১৯৯৮, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, জুন ১৯৯৮।
১৮। Economic Trend, September 1998, Bangladesh Bank.
১৯। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অগ্রিম প্রকাশনা-মূল্য ও মজুরী পরিসংখ্যান, জুন ১৯৯৮।
২০। অর্থমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার, দৈনিক ইত্তেফাক, নভেম্বর ১৯৯৮।
২১। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী ১৯৯৭-৯৮, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, জুন ১৯৯৮।
২২। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রেস বিজ্ঞপ্তি।
২৩। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী, ১৯৯৭-৯৮, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, জুন ১৯৯৮।

জ্ঞানযোগ-এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত
সৈয়দ আজহারুল হকের
অন্যধারার উপন্যাস **'চালচিত্র'** পড়ুন।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকের আরো একটি উদ্যোগ

পরিবহণ বিনিয়োগ প্রকল্প

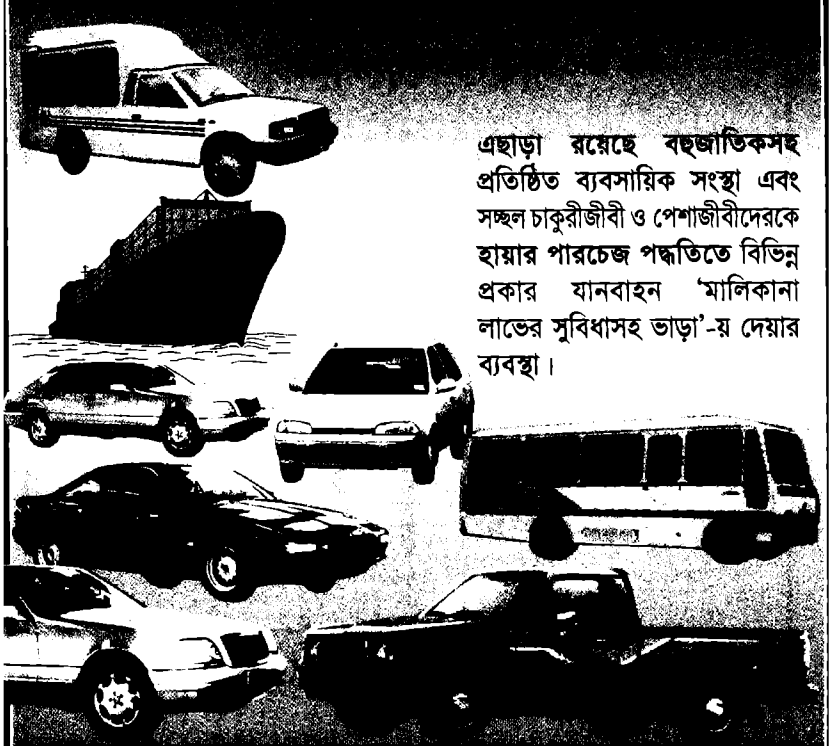

এছাড়া রয়েছে বহুজাতিকসহ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক সংস্থা এবং সচ্ছল চাকুরীজীবী ও পেশাজীবীদেরকে হায়ার পারচেজ পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকার যানবাহন 'মালিকানা লাভের সুবিধাসহ ভাড়া'-য় দেয়ার ব্যবস্থা।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ব্যাংকের যেকোন শাখায় যোগাযোগ করুন

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত

www.pathagar.com

রাষ্ট্রচিন্তার প্রকাশনায়
আমরাও
গর্বিত অংশীদার

দি আমু প্রিন্টার্স
উন্নতমানের অফসেট ছাপার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
৮২ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৩৩৪৭৩৯

www.pathagar.com

দেশ পেপার এণ্ড লেদার প্রোডাক্টস
—এর পক্ষ থেকে
'রাষ্ট্রচিন্তা'র আত্মপ্রকাশে
জানাই অভিনন্দন

এম বি এফ (প্রাঃ) লিমিটেড

দেশ পেপার এণ্ড লেদার প্রোডাক্টস

হেড অফিস ও শোরুম ঃ ৫৬ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৫৫২৫৯৬, ৯৫৫১২১২

www.pathagar.com

'রাষ্ট্রচিন্তা'র আত্মপ্রকাশে

আমাদের শুভেচ্ছা

চৌকস

ডিজাইন প্রিন্টিং পাবলিকেশন

১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা-১০০০ ফোন-৪১৯৬৫৪